যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই।

ব্রহ্মপুত্রের পারে

তসলিমা নাসরিন

আগামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই!

তসলিমা নাসরিনের জন্ম ২৫ আগস্ট ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে পাস করে ১৯৯৩ সাল অবধি চিকিৎসক হিসেবে সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেছেন। চাকরি করলে লেখালেখি ছাড়তে হবে– সরকারি এই নির্দেশ পেয়ে তিনি সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন।

তসলিমা নাসরিন ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আপসহীন নারীবাদী লেখক। লেখালেখির জন্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, আবার বিতর্কিতও হয়েছেন। নারীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি শুধু ধর্মীয় মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হননি, গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মৌলবাদীরা সারাদেশ জুড়ে তাঁর ফাঁসির জন্য আন্দোলন করে, এমনকি তাঁর মাথার মূল্য ঘোষণা করে। এর পরিণামে তিনি ১৯৯৪ সালে তাঁর প্রিয় স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। দেশে এখনও ঝুলছে তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া, বাকস্বাধীনতাবিরোধী লোকদের ঠুকে দেওয়া অনেকগুলো মামলা। মানবতার পক্ষে লেখা তাঁর তথ্যভিত্তিক উপন্যাস *লজ্জা*, নিজের শৈশব স্মৃতি নিয়ে *আমার মেয়েবেলা*, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি নিয়ে লেখা *উতল হওয়া*, আত্মজীবনীর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড ক এবং *সেইসব অন্ধকার* বই পাঁচটি সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রথমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বৈরীভাব সৃষ্টি হতে পারে এই আশংকা দেখিয়ে এবং পরে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত করা হয়েছে এই অপরাধের ভিত্তিতে তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড *দ্বিখণ্ডিত* পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এক বছর ন' মাস ছাব্বিশ দিন নিষিদ্ধ থাকার পর হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়েছে বই।

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

ISBN 978 984 04 1517 5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই বাংলায় এই বইয়ের (পশ্চিমবঙ্গে *দ্বিখণ্ডিত*, বাংলাদেশে ক) কারণে দু'জন লেখক তাঁর বিরুদ্ধে মোট একুশ কোটি টাকার মামলা রুজু করেছেন।

দীর্ঘ নির্বাসন জীবনে তসলিমা নাসরিন প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান অর্জন করেছেন। এর মধ্যে আছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট থেকে মুক্তচিন্তার জন্য শাখারভ পুরস্কার, ধর্মীয় শান্তি প্রচারের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার, ফরাসি সরকারের মানবাধিকার পুরস্কার, ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য ফ্রান্সের এডিট দ্য নান্ত পুরস্কার, সুইডেনের লেখক সংস্থা থেকে কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কার, জার্মানির মানববাদী সংস্থার আরউইন ফিশার পুরস্কার, নারীবাদ বিষয়ে লেখালেখির কারণে ফ্রান্সের সিমোন দ্যা বোভেয়া পুরস্কার, আমেরিকার ফেমিনিস্ট প্রেস পুরস্কার। বেলজিয়ামের গেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লোভেইন, আমেরিকার ইউনির্ভাসিটি অব প্যারিস এবং প্যারিস ডিডেরো ইউনির্ভাসিটি থেকে পেয়েছেন সাম্মানিক ডক্টরেট। ফেলোশিপ পেয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ভারত থেকে নির্বাচিত কলাম এবং আমার মেয়েবেলা গ্রন্থের জন্য দু'বার আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়সহ মোট তিরিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তসলিমার বই। মানববাদ, মানবাধিকার, নারী-স্বাধীনতা ও নাস্তিকতা বিষয়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন মঞ্চে এবং হার্ভার্ড, ইয়েল, অক্সফোর্ড, এডিনবরা, সরবনের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সারা বিশ্বে তিনি একটি আন্দোলনের নাম।

কলকাতায় স্থায়ীভাবে তিন বছর বসবাসের পর তাঁর ওপর মৌলবাদী হামলার ফলস্বরূপ ২০০৮ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তবে ভারতে গত বছর তিনি বাস করার অনুমতি পেয়েছেন। এখনও তিনি যাযাবর জীবনযাপন করছেন। ফেরার অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশে অথবা পশ্চিমবঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!

তসলিমা নাসরিন

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

যারা ভালোবাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

মৃত্যু ৯
হিমঘর ২৮
শব ব্যবচ্ছেদ ৬৮
সৎকার ৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু

নূপুর খবরটা পায় সকালে। সারাদিন কাউকে জানায় না। কাকেইবা জানাবে! কে তার পাশে এসময়ে দাঁড়াবে ! আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কিনা খবরটা শুনে বিচলিত হবে, মুষড়ে পড়বে, বা চোখের জল ফেলবে। উপদেশ হয়তো কেউ কেউ দেবে। কিন্তু যাদের কোনও কিছু যায় আসেনা যমুনার-কী-হল না-হল'য়, তাদের উপদেশ শোনার চেয়ে, নূপুর ভাবে, তার নিজের যা ভালো মনে হয় তাই করা উচিত। ভেবেও নূপুর জব্বার চৌধুরীকে ফোন করে সন্ধ্যের দিকে। জব্বার চৌধুরীর বয়স, প্রায় পঁচাত্তর। খবরটা শুনে জানতে চাইলেন যমুনা আমেরিকায় থাকতো কিনা। ভারতে থাকতো শুনে তাঁর রাগ হয় খুব। বললেন, 'ইণ্ডন্ডয়ায় কেন থাকতে গেছে ? ও কি জানে না ইণ্ডিয়া বাংলাদেশকে পানি দিচ্ছেনা ? ইণ্ডিয়াকে বয়কট করা উচিত ছিল যমুনার'। জব্বার কাকার কথা এরপর আর শুনতে ইচ্ছে করেনি। সুলেখাকে জানায় নূপুর। সুলেখা খালাতো বোন। যমুনার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ ছিল দেশে থাকাকালীন। খবরটি যেকোনও খবর শোনার মতোই শুনলো, বললো, 'সবাইকেই যেতে হবে নূপুর। নিজে কী পূণ্য কামাই করলে, সেটা দেখ। সবাই ইয়া-নবসি-ইয়া-নবসি করবে। যমুনা আজ গেছে, কাল আমরা যাবো'। আহ্, সবাইকে যে যেতে হবে, যেন নূপুর একথা আগে জানতো না !

রাত দশটার দিকে নূপুর নাইমকে ফোন করে। এ ফোনটি করার কোনও মানে হয়না জেনেও ফোনটি করে। জানে যমুনার যদি বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগ থাকতো, এই ফোনটি করতে সে বাধা দিতই। জেনেও সে খবরটা জানায় নাইমকে। পরিবারের লোক হিসেবে জানার অধিকার তার আছে বলেই বলে, এছাড়া আর কোনও কারণ নেই। ফোনটি করার আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর নিজেকে বারবারই কথা দেয়, সে কাঁদবে না। কারণ আর যার কাছেই হাহাকার করা মানায়, নাইমের কাছে মানায় না।

ফোন ধরে ছিল নাইমই।

— দাদা, তপু ফোন করেছিল।

— তপু কে ?

— বুবুর মেয়ে।

— যমুনার মেয়ে ?

— তোমার তো জানার কথা যে বুবুর মেয়ের নাম তপু। তপু এখন আমেরিকায় পিএইচডি করছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে। ফিজিক্সে।

— এই তপুই সেই তপু তা জানবো কী করে ? তা ফোন করেছে বলে আমার হয়েছেটা কী ? আমার কী করার আছে। এ বাড়ি আমার। তুই কোনও অপু তপুর হয়ে তদবির করবি না, আগেই বলে দিয়েছি। কোনও বাস্টার্ড কী করলো, ফোন করলো কী না করলো, আই ডোন্ট কেয়ার।

— আমি জানি তুমি কেয়ার করো না। বুবুর ফ্ল্যাটটায় তুমি আজ প্রায়, কত বছর হল, পঁচিশ বছর, আছো। লোকে এখন ওটাকে তোমার ফ্ল্যাট বলেই জানে, একথা তুমিও জানো। এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমি ফোন করিনি। তপুও আমাকে ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলতে ফোন করেনি। আসলে দেশের বাড়ি-ঘর নিয়ে তপুর কোনও আগ্রহ নেই।

— তাহলে কে ফোন করেছে না করেছে তা শোনাতে গভীর রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলছিস কেন ?

— ও, তুমি এই দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে ? তাহলে কাল ফোন করি। বরং কালই কথা বলি। তুমি ঘুমোও।

— কাল আমার সময় নেই। আজই বল যা বলার। ফ্যামিলির পেছনে সব এনার্জি খরচ করেছি। আর আমি পারবো না। আমার একটা লাইফ আছে, নাকি নেই ?

— এনার্জি যদি খরচ করে থাকো, সে তোমার নিজের ফ্যামিলির পেছনে করেছো। আমার আর বুবুর জন্য তোমার পকেটের দুপয়সাও খরচ হয়নি কোনোদিন। কোনও এনার্জিও খরচ হয়নি। যদি কখনও এনার্জি খরচ করে থাকো, সে আমাদের ঠকাবার ফন্দি আঁটার এনার্জি, আর কিছুর নয়।

— কী বলতে চাস তুই ?

— তুমি ভালো করে জানো কী বলতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এত রাতে ফোন করেছিস কেন ?

— খুব বেশি রাত হয়নি। রাত দশটায় তুমি ঘুমোও না। দশটার পরে তোমার মদ খাওয়া শুরু হবে। রাত দুটো-তিনটেয় ঘুমোবে তুমি।

— তাতে তোর কী ! আমার পয়সায় আমি মদ খাই। তোর পয়সায় মদ তো খাই না।

— হিসেব করে দেখো, আমার আর বুবুর পয়সায় অনেক খাচ্ছো। বাবার জমি-জমা, টাকা-পয়সা একা আত্মসাৎ না করলে, তিন জনের মধ্যে সবকিছু ভাগ করলে, তোমার 'তোর পয়সায় বা তোদের পয়সায় মদ খাই না' একথাটা বলা সাজতো।

— তোর এইসব প্যানপ্যানানি শুনতে আমি পারবো না। তোকে আমি ফাইনাল বলে দিয়েছি, বাবার সম্পত্তি নিয়ে কোনও কথা বলতে পারবি না। আমাদের ময়মনসিংহের বাড়ি তোকে আমি লিখে দিয়েছি।

— না, তুমি লিখে দাওনি। এ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বাজারে যা দাম, তার দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনেছি।

— তোর বাজে কথা অনেক সহ্য করেছি। বাড়ি বাজারের চেয়েও কম দামে তোকে দিয়েছি।

— তুমিও জানো তুমি মিথ্যে বলছো, এ বাড়ির দাম যখন দু'কোটি টাকা, তুমি চার কোটি নিয়েছো।

— এই জন্যই বলি মেয়ে মানুষের সঙ্গে কারবার করতে নেই। তোর কাছে বিক্রি করাই উচিত হয়নি।

— করছো টাকার লোভে। এতগুলো টাকার লোভ কী করে সামলাবে !

— দ্বিগুনই যদি দাম নিই, তুই কিনলি কেন ? তোর কোনও স্বার্থ না থাকলে তুই কিনেছিস আমার বাড়ি ?

— প্রথমত এটা তোমার একার বাড়ি নয়। আমি আর বুবুও এই বাড়ির ভাগ পাই। কিন্তু যেহেতু তুমি একাই গায়ের জোরে বলছো এই বাড়ি তোমার, এই বাড়ি তোমাকে লিখে দিয়ে গেছে বাবা, যেহেতু তুমি আমাদের ভাগ আমাদের দেবে না, অগত্যা কিনেছি। দ্বিগুণ বেশি দাম দিয়ে কেনার কারণ, স্মৃতি। আর কিছু না। বাড়িটার ওপর টান আছে বলে কিনেছি।

— তোর টান আছে, আমার টান নেই ? ওই বাড়িতে আমি থাকিনি, তোরাই থেকেছিস ?

— থেকেছো কিন্তু টান নেই। টান থাকলে দশগুণ দাম পেলেও তুমি বিক্রি করতে না। যেমন আমি করবো না। যাকগে, এসব পুরোনো কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই কথা বহুবার হয়েছে আমাদের মধ্যে। বলতে চেয়েছিলাম তপু ফোন করেছিলো।

— আশ্চর্য ! ও তোকে ফোন করে, তুই ওকে ফোন করিস। এসব তোদের ব্যাপার। আমাকে জানানোর মানে কী ?

— তপুর সঙ্গে মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয় আমার। তপুকে কি কোনো দিন ফোন করেছো ? জানো ও দেখতে কেমন ? কবে ওকে শেষ দেখেছিলে ? কোনও দিন জানতে চেয়েছো ওর কথা ? ও কেন তোমাকে ফোন করবে ! বেচারা জানেও না ফ্যামিলি কাকে বলে। একবার শখ করে এসেছিল নিজের দেশ দেখতে, আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে, ওর নিজের মা'র ফ্ল্যাটটাতেই তো থাকতে দাওনি। কী যেন বলেছিলে ? গেস্ট আছে। গেস্ট মানে তো তোমার শ্বশুর বাড়ির লোক। ওরাতো সারা বছর বুবুর ফ্ল্যাটেই থাকে। তপুর জন্য জায়গা হয় না। ওকে হোটেলে উঠতে হয়েছিল।

— ফ্ল্যাট নিয়ে এতকথা বলবি না, নূপুর। সহ্যের একটা সীমা আছে আমার। আমি যদি ফ্ল্যাটটা না টেককেয়ার করতাম, এটা এত দিনে পাড়ার গুণ্ডা-পাণ্ডারা নিয়ে নিত। আমি দেখা-শুনা করছি, মেইনটেইনেন্স দিচ্ছি। কম টাকা খরচা হচ্ছে আমার ?

— থাকছো যখন বাড়িতে, তোমার ময়লা ফেলার খরচা, তোমাকে পাহারা দেওয়ার খরচা তো তোমাকে দিতেই হবে। বাড়িটায় ভাড়াটে থাকলেও তাই করতো।

— তুই এতকাল আমেরিকায় কাটিয়েছিস। তুই এদেশের অনেক কিছু জানিস না। আমি না থাকলে অনেক ক্ষতি হত ফ্ল্যাটের।

— তুমি না থাকলে একটা লাভ হত, বুবু ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতে পারতো।

— বিক্রি ? যমুনা ফ্ল্যাট কী করে বিক্রি করতো, শুনি ? ওকি দেশে আসতে পারতো বিক্রি করতে ? এয়ারপোর্টে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে দড়ি বেধে জেলখানায় নিয়ে যেতো।

— বাজে কথা বলো না।

— আমি বাজে কথা বলি না।

— বুবুর বিরুদ্ধে কেউ মামলা করেনি। কে তাকে জেলখানায় নিত ? কেন নিত ?

— এলেই মামলা করতো। ভালো যে আসেনি। বাই দ্য ওয়ে, তপু কেন ওর বাবার ফ্যামিলির কাউকে দেখতে যায়নি ? ওই ফ্যামিলি কেন ওকে রিসিভ করলো না ? বাড়িতে রাখলো না ? গুলশানে তো বিরাট বিরাট বাড়ি আছে ওর বাবার !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এসব কেন বলো ! তুমি ভালো করেই তো জানো ওরা কেউ জানে না তপুর কথা। বাবা বা বাবার ফ্যামিলি সম্পর্কে তপু নিজেও কিছু জানেও না। কোনও আগ্রহ জন্মায়নি তপুর। তপু মানুষ হয়েছে তপুর মা'র কাছে।

— সো ?

— সো আবার কী ? তোমাকে ইনফরমেশনটা দিলাম। তুমি জানো, তারপরও দিলাম। কনভেনশানাল জীবনের বাইরেও জীবন থাকে মানুষের। কোনোদিন কি বুঝতে চেয়েছো ? শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখে গেছো।

— শোন তোর এসব কমপ্লেইন শুনলে আমার চলবে না। তোর কাজ-কম্ম নেই। বসে বসে আমেরিকার ডলারে ল্যাভিস লাইফ লীড করছিস। আমাকে খেটে খেতে হয়। অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি রাখি।

নূপুর থামায় নাইমকে। ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বলে — আমার এটা জানানো কর্তব্য বলেই জানাচ্ছি। পরে আমাকে যেন দোষ না দাও, আবার যেন না বলো যে আমি কোনও বদ উদ্দেশে খবরটা গোপন রেখেছি। শোনো, তপু জানালো বুবু মারা গেছে।

কিছুক্ষণ কোনও শব্দ নেই।

একটা স্তব্ধতা ফোনের দু'পারেই।

নূপুরের চোখে জলের ধারা। বাঁ হাতে ফোনের রিসিভার। ডান হাতে মুখ চেপে রাখা। নাইম যেন কোনো আর্তস্বর না শোনে।

— ও এই কথা ?

নাইম প্রথম কথা বলে।

নূপুর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে — হ্যাঁ এই কথা। এও জানালো, তপু ইন্ডিয়ায় যাবে না, ওর মাকেও যেমন হাসিখুশি, লাইভলি দেখেছে, ওই স্মৃতিটাই রাখতে চায়। ও বুবুর ডেডবডি দেখতে চায় না।

— চায় না তো আমাকে জানাচ্ছিস কেন !

— না, তোমাকে কোনও কতর্ব্য পালন করার জন্য জানাচ্ছি না। যা করার আমিই করবো। আমি চাইও না তুমি বুবুর কোনও কিছুতে নাক গলাও। পঁচিশ বছর তোমার কিছু যায় আসেনি বুবুর কোনো কিছু নিয়ে, এখনও সেভাবেই থাক। শুধু বুবুর বদনামটা যেমন করে গেছো এতকাল, সেটা অন্তত কোরো না কিছুদিন। আমি কলকাতা যাচ্ছি শিগগির। তোমাকে ফোন করেছিলাম শুধু এটুকু জানাতে, তোমার ছোট বোন যমুনা আর নেই। এটুকু, পরিবারের লোক হিসেবে জানানো কর্তব্য বলেই জানিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর নিজেই ফোন রেখে দেয়। রেখে দেয় কারণ তার হাত কাঁপছে, তার ঠোঁট কাঁপছে। ফোন রেখে তাকে বারান্দায় ছুটে যেতে হয়, লম্বা শ্বাস নিতে হয়। চিৎকার করে তাকে কাঁদতে হয় কিছুক্ষণ।

ফোন বেজে গেছে এর পর। নাইম করেছে ভেবেই ফোন সে ধরেনি। ফোন ধরেনি, কারণ সে কেঁদেছে। শুয়েছে। বারবার খাট থেকে নেমেছে। জল খেয়েছে। আবার শুয়েছে। এপাশ ওপাশ করেছে। বুকে চিনচিন ব্যাথা। ফুঁপিয়েছে। শান্ত হয়েছে। সারারাত যমুনার কথাগুলো মনে বেজেছে। যমুনা বলতো, 'আয়, নূপুর একবার আমার কাছে আয়, অনেক দিন তোকে দেখি না'। যাই যাই করেও যাওয়া হয়নি নূপুরের। আর কিছু দিন বা ক'টা মাস পরই হয়তো যেত। বাড়িটা গুছিয়ে নিয়েই যেত। বাড়িটা গোছাতে গোছাতেই বছর চলে গেল। যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এত কী গোছানোর আছে !' নূপুর ঠিক কী বলবে বুঝে পায়নি। আসলে যমুনার ওই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরেই 'কী করছিস চলে আয়'-এর আহবানকে অবজ্ঞা করতে করতে অবজ্ঞা করাটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল।

একটা ভীষণ বিষণ্ন অসহ্য রাত্তির যায়, সকালের দিকে রাস্তায় পড়ে থাকা এতিম শিশুর মতো কুঁকড়ে শুয়ে থাকে নূপুর। প্রতিদিনের মতো চা দিয়ে যায় দুলি। চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকে বারোটায় নাইমের ফোনে ঘুম ভাঙে।

— কী হয়েছিল রে ? কী অসুখ ? বলতে চাইছি কী অসুখে মরলো ? নাইম জিজ্ঞেস করে। গলাটা ভাঙা।

নূপুর দুলিকে ডেকে ওই ঠাণ্ডা চা'টাই গরম করে দিতে বলে। চা না খেলে নূপুর দিন শুরু করতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'জানিনা দাদা। মনে হয় হার্ট অ্যাটাক। ব্লাডপ্রেশার তো বেশি ছিল'।

— প্রেশার কবে থেকে ? প্রেশার তো আমারও আছে।

— হ্যাঁ বাবার কাছ থেকে ওই প্রেশারটা পাওয়া। তুমিও পেয়েছো, বুবুও পেয়েছে।

— ওষুধ খেতো না নাকি ?

— খেতো তো।

— খেলে হার্ট অ্যাটাক হবে কেন ?

— প্রেশার না থাকলেও তো হার্ট অ্যাটাক হয় ! কোলেস্টারোল বেশি হলে বা ব্লাড ক্লট বেশি হলে। কী কারণে বুবুর এমন অ্যাটাক হল, তা জানা দরকার।

— অবশ্য বয়সও তো হয়েছিল। কিন্তু ওর মেয়ে কী বললো, কী ভাবে মারা গেছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— না, ও কিছু বলেনি। ওকে কেউ একজন ফোনে জানিয়েছে বুবু মারা গেছে।

— কে জানিয়েছে ওকে ?

— কলকাতা থেকে একজন জানিয়েছে।

— যে জানিয়েছে, সে কী যমুনার কিছু হয় ? মানে কোনও রিলেটিভ ? ওই সময় ছিল সে ? মানে মারা যাওয়ার টাইমে ছিল ? নাম কী লোকটার ?

— কে খবরটা জানালো তপুকে, এটাতো কোনও ইম্পর্টেন্ট কোনও বিষয় না ! রিলেটিভ বুবু কলকাতায় কোথায় পাবে ? বুবু তো একাই থাকতো ! কোনও বান্ধবী বা কলিগ হয়তো জানিয়েছে।

— তুই কেন জিজ্ঞেস করিসনি কে ফোন করেছিল তপুকে, কে জানিয়েছে খবরটা ? যে ফোন করেছিল, তার ফোন নম্বরটা বরং নে। তার সঙ্গে সরাসরি কথা বল। কী হয়েছিল, ঘটনা কী, সব কিছু জানতে চা। হুট করে কোনও ডিসিশান নিস না। এটা উড়ো কোনো খবর কিনা যাচাই করে দেখ। কলকাতার মানুষ কিন্তু ভালো না। হয়তো যমুনার টাকা-পয়সার লোভ ওকে গুম করে দিয়েছে।

— তপু বলেছে, মহিলা কী যেন নাম, আরতি বা নিয়তি বুঝতে পারছে না একা কী করে কী করবে। তপুকে কলকাতায় যেতে বলেছে। বলেছে লাশ আমরা মর্গে রেখে দিচ্ছি। তুমি এসে যা করার করো'। এও জানিয়েছে বুবু নাকি ডেড বডি মেডিকেল কলেজে দান করে গেছে।

— কী করে গেছে ?

— দান করে গেছে।

— পুরো বডিটাই ?

— হুম।

— মেডিকেল কলেজ ওর বডি দিয়ে কী করবে ?

— বডি কেটে কেটেই তো শেখে স্টুডেন্টরা। তাছাড়া ডেড বডি রিসার্চের কাজেও লাগে।

— বডির কি অভাব আছে নাকি আজকাল ? বডি দিয়েছে ভালই করেছে। বডি বহন করার ঝামেলা গেল। বাঙালিরা বিদেশ থেকে বডি আনছে দেশে। খরচও তো সাংঘাতিক। আমি তো বলি ওদের, যেখানে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে, সেখানে কবর দাও, বডি দেশে আনার দরকারটা কী। ওদের জানিয়ে দে, মেডিকেলে দিয়ে দিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি গেলেই নাকি সব হবে।

— কবে যাবি ?

— যাবো, কালই যাবো।

— বাড়ি গাড়ি আছে ?

— মানে ?

— মানে বাড়ি গাড়ি আছে কিনা। সহায় সম্পত্তি কোথায় কী অবস্থায় আছে তা দেখতে হবে তো।

— এই সময় বিষয় আশয় নিয়ে চিন্তা করছো ? মানুষটা মারা গেছে, দাদা। মানুষটা আর নেই।

— শোন, যা কিনেছে সব বিক্রি করে দিয়ে আয়। ভ্যালুয়েবল জিনিস-পত্র, সোনা-দানা টাকা-পয়সা এ সব শুধু নিয়ে আয়। অন্য কিছু আনিস না। দেখা যাবে, ওসবের যা দাম, ট্রান্সফার করতে গেলে তার চেয়ে দাম পড়েছে বেশি। কিছু অসুবিধে হলে বাংলাদেশ অ্যামবেসির সঙ্গে যোগাযোগ করিস। ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, কামাল চৌধুরী, আমি ওকে জানিয়েও রাখবো।

— ঠিক আছে।

— আসলে আমারই যাওয়া উচিত। তুই কি এতসব পারবি ? তুই পারবি না। একটা পুরুষ মানুষ থাকা উচিত।

— না না না, আমিই পারবো। না পারার কী আছে ! বুবুর দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ওরা নিশ্চয়ই হেল্প করবে। কী যেন নাম, মুন, আর বোধ হয়, গার্গী। ওদের ঠিকানা ফোন নম্বর কিছুই অবশ্য এখন আমার কাছে নেই। ও বের করে নেওয়া যাবে। একবার তো গিয়েছিলাম কলকাতায়। ঢাকা হয়ে আমেরিকা যাওয়ার পথে থেমেছিলাম। দু'দিন ছিলাম। জয় তখন কোলে। ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বুবু একটা ভাড়া বাসায় থাকতো। তপু ছোট ছিল। কলকাতার ভালো একটা ইস্কুলে বুবু ওকে ভর্তি করানোর জন্য খুব চেষ্টা করছিল। বলেছিল আর ক'টা দিন থাকতে। জয় এত বিরক্ত করছিল, থাকিনি।

— শোন, কাজের কথা বলি। ওখানকার কোন ব্যাংকে কত আছে, এ সব জানতে হবে। আর ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে অত সহজে টাকা ট্রান্সফার করা যায় না। পারমিশান টারমিশান নেওয়ার ব্যাপার আছে। আমার তো ভারতের ভিসা আছে, গত মাসে নিয়েছিলাম। নতুন একটা ব্যবসা শুরু করার জন্য দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। ওই ভিসায় ঘুরে আসতে পারবো। দেখি কালকের একটা টিকিট করতে পারি কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— সব কিছু আমিই পারবো, দাদা। তোমার দরকার নেই যাওয়ার।

— দরকার নেই মানে ?

— মানে তোমার সঙ্গে তো ভালো সম্পর্কটাও ছিল না। তুমি তো বুবুর খোঁজও নাওনি। এক আমিই যা নিয়েছি। অবশ্য আমিই বা কত খোঁজ নিয়েছি। আমারও ঝামেলা টামেলা ছিল। সব সময় যোগাযোগ করতে পারিনি। নিজের সংসার নিয়েই তো ডুবে ছিলাম। কনটাক্ট বেশির ভাগ বুবুই করতো। সব সময় তো ফোনও ধরতাম না। ডিপ্রেশনে থাকলে কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। জানি না বুবু বুঝতো কিনা। অনেক কিছুই তো ও বুঝতো। বুবুটা খুব একা ছিল। ফ্যামিলির কারো সাপোর্ট পায়নি। যদি পেতো..

নূপুরের কথা শেষ না হতেই ধমকে ওঠে নাইম।

— ফ্যামিলির সাপোর্ট কী করে আশা করে ? আমরা যে ওর বিরুদ্ধে কেইস করিনি, পুলিশে খবর দিইনি, এটাই তো বেশি। আর কী চায় ও ?

— না, কিছু চায় না। চাওয়ার জন্য তো আর বসে নেই ! তুমি কেন সাপোর্ট করবে, তাই তো ! বুবু ফিরে আসবে বলে তোমার ভয় ছিল, ফ্ল্যাটটা যদি ফেরত চায় ! সেই ভয়টা এখন নিশ্চয়ই জন্মের মতো গেছে। বেশ চেঁচিয়ে কথা-টথা বলছো। তোমার মনটা কী দিয়ে গড়া, বলো তো ? আমরা তো একই মা'র সন্তান ! কেন তুমি এত ভিন্ন মানসিকতার ! মাঝে মাঝে ভাবি, তুমি মা'র পেটেই ছিলে তো নাকি কোথাও থেকে এনে তোমাকে অ্যাডপ্ট করেছে !

— বাজে কথা রাখ। তোর বোনকে ফ্যামিলি সাপোর্ট করেনি।

লজ্জা করে না বলতে ? একটা মার্ডারারকে সাপোর্ট কী করে করবো আমরা ? ও তোর বোন হতে পারে, কিন্তু ভুলে যাবি না ও একটা লোককে খুন করেছে। একটা খুনীর জন্য অত দরদ কেন তোর ? তাহলে বলতে হবে খুনের পেছনে তুইও ছিলি। আমাদের চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনও খুন করেছে ? আমি খারাপ, আমি অমানুষ, নাকি যমুনা খারাপ, যমুনা অমানুষ ? লোকদের জিজ্ঞেস কর, কী বলে দেখ। দেখ সবাই কাকে অমানুষ বলে। খুনী মরেছে তো কী হয়েছে ! খুনী মরুক, তাই তো সবাই চায় ! খুনীরা জেল খাটে, খুনীদের ফাঁসি হয়, যাবজ্জীবন হয়। আর ওর তো কিছুই হয়নি। দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে দিব্যি আরামে ছিল এতগুলো বছর। এখনও মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। খুনীর ভাই বলে এখনও লোকে আঙুল তুলে দেখায়।

— চিরকাল তো একই কথা বলছো। অন্তত আজকের দিনটা বন্ধ করো এসব কথা। মানুষটা ছিল, মানুষটা নেই !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— সো ?

— সো একটু ভাবো ওর কথা। ও কি ভালো কিছু করেনি ? শুধু খুনই করেছে ? খুন তো অকারণে করেনি।

— সব খুনীই বলে যে খুন করার পেছনে কারণ ছিল।

নাইম আরও কিছুক্ষণ চেঁচায়। আরও কিছুক্ষণ যমুনাকে কুচিকুচি করে কেটে ওতে নুন আর লঙ্কা মেখে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। গলার স্বরে তীব্র রোষ, বিদ্রুপ, ঘৃণা। নূপুর ফোন রেখে দেয়। যমুনার প্রসঙ্গ উঠলে নাইম এমন কম দিনই আছে, যে দিন যমুনাকে খুনী বলে গালি দেয়নি ! আজকের দিনটা অন্তত অন্য রকম হতে পারতো। আজকের দিন অন্যদিনের মতো নয়। আজ যমুনা নেই। নূপুরের আজ কোনও মন্দ কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না।

নূপুর জানে নাইম মিথ্যে কথা বলছে। নাইমকে খুনীর ভাই বলে কেউ আঙুল তুলে দেখায়, এ নূপুরের বিশ্বাস হয় না। যমুনা না জানালে হয় তো কেউ জানতোই না খুনের ঘটনাটি। আর নূপুর নাইমকে তখন না জানালে নাইমও জানতে পারতো না। নূপুরের বিয়ের উৎসব জাঁক জমক করার পেছনে নাইমের বড় একটা ভূমিকা ছিল, সে কৃতজ্ঞতাই কী না নূপুর জানে না নাইমের ওপর তার বেশ একটা বিশ্বাস জন্মেছিল। বিশ্বাস জন্মেছিল বলেই যমুনা যে কথা শুধু তাকেই বলেছিল, শুধু নূপুর সে কথা এর ওর কানে দিয়েছিল ? নূপুর কি ভেবেছিল কাছের মানুষগুলোকে জানিয়ে রাখলে বিপদ-আপদে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ! নাকি যমুনার ওই খুনটাকে মনে মনে সে মেনে নিতে পারেনি বলেই রাষ্ট্র করেছিল !

জীবনকে যদি পেছনে নেওয়া যেত। একটা শুধু রিমোট কন্ট্রোল থাকতো, তাহলে ভুলগুলো শুধরে নেওয়া যেত। বড় অসহায় বোধ করে নূপুর। এরমধ্যে আবার ভীষণ মাথা ধরে। এই মাথা ধরা রোগটা বাড়ে যখন কারও কুৎসিত ব্যবহার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই কারণেই নূপুর চায় না নাইমকে ফোন করতে, ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের কথা জানাতে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে নাইম সবসময়ই বেশ দক্ষ।

যমুনা খুনী হোক আর যাই হোক, নূপুরের বোন যমুনা। দায়িত্ব তাকে এখন নিতেই হবে। কলকাতায় যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তার নাম ফোন নম্বর সব তপুর কাছ থেকে নেয়। নির্মলা বসু। যমুনার বাড়িতে থাকছে বহু বছর। কেন থাকছে, ভাড়া থাকছে, নাকি কেয়ার টেকার, নাকি বাড়ির কাজে সাহায্য করার জন্য, নাকি বাড়ির খরচ শেয়ার করার জন্য একজন হাউজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেট, নূপুর আর তপুকে জিজ্ঞেস করে না। নির্মলাকে ফোন করে নূপুর জেনে নেয় কতদিন সে চেনে যমুনাকে, কী করে পরিচয়, যমুনার বাড়িটা ঠিক কোথায়, যেখানে যমুনাকে রাখা হয়েছে, সেটাই বা কতদূর বাড়ি থেকে। নূপুর যাক, এ নির্মলা চাইছে, নির্মলা জানিয়ে দেয়, কলকাতায় আর যাঁরা আছেন যমুনার চেনা পরিচিত বন্ধু শুভাকাংখী, সবাই চাইছে।

নির্মলার সঙ্গে যমুনার পরিচয় কলকাতায়। বাড়ি খুঁজছিল কেনার জন্য। বিজ্ঞাপন দেখে অনেক বাড়িই দেখে এসেছে, পছন্দ হয়নি। যে বাড়িটি পছন্দ হল, সে বাড়ি নির্মলারই কাকার বাড়ি। নির্মলা তার বয়স হয়ে যাওয়া সন্তানহীন কাকা কাকীমার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়েছে। বোলপুরের গ্রামে থাকতো বাবা মা। কথা ছিল, তার কাকা কাকীমাই তাকে কলেজে পড়াকালীন সময়ে একটা পাত্র জুটিয়ে বিয়ে দেবে। পাত্রও জোটেনি, বিয়েও হয়নি। ওদিকে গ্রামে বাবা মা দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। কাকা কাকীমা একসময় সিদ্ধান্ত নিলেন, এত বড় বাড়িতে বাস করার কোনো মানে হয়না, তারচে' বাড়ি বিক্রি করে শহরে অনেক ফ্ল্যাট হচ্ছে, একটি কিনে নেবেন, ফ্ল্যাটও হবে, হাতে কিছু টাকাও রইবে জমা করে রাখার জন্য। বাড়িটা কিনেছিল যমুনা। আর ওই বাড়ি কেনা বেচার কারণে ঘন ঘন দেখা হতে থাকে, ঘন ঘন কথাও হতে থাকে নির্মলা আর যমুনার। যত কথা হয় তত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। যত ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তত ভালোলাগা বাড়ে, বন্ধুত্ব বাড়ে। কাকার ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে যমুনার কিছু আসবাবপত্র কেনায় আর বাড়ি ঘর সাজানোয় সাহায্য করার জন্য নির্মলা রয়ে গেল বাড়িতে। সেই যে রয়ে গেল, আর তার যাওয়া হয়নি কোথাও, না কাকার ফ্ল্যাটে, না গ্রামে, বাপের বাড়ি। নির্মলার বয়স বিয়ের বাজারের নিয়মে বেজায় বেড়ে গেছে বলে বিয়ের দুশ্চিন্তাও ততদিনে সবাই ত্যাগ করেছে। কাকার সংসারটা যতনা নিজের সংসার ছিল, তার চেয়েও যেন যমুনার সংসার নির্মলার নিজের সংসার হয়ে উঠলো। নির্মলার বিশ্বাস পুরুষ-নারীর সংসারের চেয়ে দুটো নারীর সংসার অনেক বেশি ঝুটঝামেলাহীন।

নির্মলা একটা ইস্কুলে মাস্টারি করতো, ইস্কুলের প্রিন্সিপাল নির্মলাকে এত যৌন হেনস্থা করতো যে শেষ অবদি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চাকরিটা ছেড়ে দিতে। ওই বসে থাকা নির্মলাকে দেখতে দেখতেই যমুনা ভেবেছিল নির্মলা তো অন্য কোনও ইস্কুলে পড়াতে পারে, অন্যের ইস্কুলে না হলেও নিজের ইস্কুলে। সিস্টারহুড নামে প্রথমে একটা ইস্কুল শুরু করার কথা ভাবতে ভাবতে একটা সংগঠনের কথা ভাবে যমুনা। যেই ভাবা সেই কাজ। নির্মলার ওপরই দায়িত্ব বেশি পড়েছে। ঘুরে ঘুরে নির্মলাই সদস্য যোগাড় করেছে। টাকা পয়সা, নতুন চিন্তা, নতুন প্ল্যান বেশি গেছে যমুনার কাছ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর শোনে আর ভাবে যমুনা তাকে কেন বলেনি নির্মলার কথা। এত দীর্ঘ বছর নির্মলা বাস করছে যমুনার বাড়িতে, আর যমুনা এত কথা বলেছে নূপুরকে, নির্মলার কথা কোনও কথা প্রসঙ্গেও বলেনি। নূপুর ভাবতো যমুনা বুঝি তাকে সব বলে। যমুনা কোনোদিন তো কিছু লুকোয়নি ! একটু অভিমান হয় নূপুরের। পরক্ষণেই ভাবে কার ওপর আজ অভিমান করছে নূপুর ! নূপুরই কি কোনওদিন যমুনার বাড়িঘরের কথা জিজ্ঞেস করেছে, ক'দিনই বা জানতে চেয়েছে যমুনা কেমন আছে, কেবল তো নিজের কথাই বলেছে, নিজের নানারকম সমস্যার কথা, আর যমুনাও খুটিয়ে খুটিয়ে জানতে চেয়েছে কেবল নূপুরেরই কথা। যদি হঠাৎ কখনও কিছু নূপুর জানতে চেয়েছে, সে তপু কেমন আছে, তা।

নূপুরের অনেকবার মনে হয়েছে তপুর মতো বলে দেবে, 'তোমরা যা ইচ্ছে করার করো, আমি ওর মৃত মুখ দেখতে পারবো না। ও আমার কাছে জীবিত। আমি চাই ও জীবিতই থাকুক স্মৃতিতে'।

ভাবতে ভাবতে একবার বলেছেও নূপুর নির্মলাকে, 'আপনারাই তো অনেক বছর ধরে যমুনাদির কাছে ছিলেন। আমরা আত্মীয় হতে পারি, কিন্তু দূরেই ছিলাম, হয়তো অনেকটা বাধ্য হয়েও দূরে থাকতে হয়েছে। মাঝখানে অনেকগুলো বছরই চলে গেছে। যোগাযোগ আর কারও সঙ্গে না থাকলেও আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে...'

— আপনার কথা খুব বলতো।

নির্মলা বলে।

— বলতো বুঝি ?

— হ্যাঁ, খুব বলতো।

— কী বলতো ?'

— কত কিছু বলতো। ছোটবেলায় কোথায় কেমন করে আপনারা বড় হয়েছেন। দু'বোনে কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এসব। গল্প শুনতে শুনতে এখন আমরা আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। আপনাকেও অনেকটা নিজের লোকই ভাবি।

'নিজের লোক' ! নূপুরের ভালো লাগে শুনতে। নিজের লোক বলতে তারই বা আছে কে এখন !

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলার সঙ্গে যখন কথা হয়েছে রাতের দিকে, ভারতের ভিসা, ফ্লাইট টিকিট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কথা দু'চার মিনিটে সেরে দু'জন শুরু করে চূড়ান্ত অপ্রয়াজনীয় কথা। আপনি থেকে তুমিতে চলে আসে সম্বোধন প্রথম দিনেই।

— যমুনাদিকে অনেক দিন দেখিনি। পাঁচ বছর। পাঁচ বছর আগেই তো গিয়েছিল আমেরিকায়। এমএসএনে, ইয়াহুতে বা স্কাইপেতে আগে দেখতাম, কথা হত। সেও অনেক দিন আর হয় না। চুল পেকেছিল ?

— অর্ধেকের বেশি চুল পেকে গিয়েছিল। আমার চোখের সামনেই পাকলো। এভাবে উৎসব করে কারও চুল পাকতে দেখিনি। গ্রে হেয়ারে কিন্তু অসাধারণ লাগতো।

— ডাই করতো ?

— ডাই করবে যমুনা ? পাগল হয়েছো ? কয়েকদিন বলেছি চুলে কিছু রংটং লাগাও। গোদরেজের ভালো রং এসেছে। নাহ, লাগাবেই না। বয়স বেড়েছে বা বাড়ছে এ নিয়ে কোনও দিন কোনও দুশ্চিন্তা করেনি। ওরকমই ছিল যমুনা। আমাদের কিছু বন্ধুতো ওকে ওয়ার্কোহলিক বলে। এত ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসতো !

— কী নিয়ে ব্যস্ত থাকতো ইদানিং ?

— চাকরিটা তো করতোই...

— চাকরি !

— কেন, অগ্নি পাওয়ার এন্ড ইলেকট্রনিক্সে সোলার এনার্জির চিফ ফিজিসিস্ট ছিল। নিশ্চয়ই জানো।

— ও হ্যাঁ তাতো জানি..

— এই ব্যস্ততার মধ্যেই গড়ে তুলেছে সিস্টার হুড, সেও তো বলেছি। এখন তো বেশ বড়ই হয়েছে সিস্টার হুড। প্রায় পাঁচ হাজার সদস্য।

— তোমার কথা কিছু না জানালেও সিস্টার হুডের কথা বুবু জানিয়েছিল আমাকে। একদিন এও বলেছিল, চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই সিস্টার হুডেই নাকি সময়টা দেবে। এই রিস্কি সিদ্ধান্ত বুবুই নিতে পারে। ভাগ্যিস শেষ অবদি ছাড়েনি। ভালো একটা চাকরি ছেড়ে দিলে পরে কী হয় না হয় তা কে জানে। মানুষের বিপদের কথা কি বলা যায় ! শুধু কি চাকরি আর সিস্টার হুড ! তপুকে মানুষ করেছে।

নির্মলা হেসে বলে, তপুর পেছনে যমুনাকে মোটেই ব্যস্ত থাকতে হয়নি বললেই চলে। তপুটা এমনি এমনি বড় হয়ে গেল। যমুনা তো ওকে একেবারেই বাঙালি মায়েদের মতো বড় করেনি। ভালো স্কুলে পড়েছে, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকুই। ঘরে মাস্টার টাস্টার রেখে দেয়নি। পড়া বুঝতে না পারলে যমুনাকে জিজ্ঞেস করতো।

— মাস্টার টাস্টার রেখে দেয়নি, এর মানে এই নয় যে তপুকে ভালোবাসতো না। ভীষণ ভালোবাসতো। কিন্তু বাইরের কেউ সহজে বুঝতো না। আসলে যমুনা তো তপুকে নানা রকম খাবার খাইয়ে বা জিনিসপত্র কিনে দিয়ে বোঝাতে চাইতো না যে সে তপুকে ভালোবাসে।

— এটা কিনে দাও, ওটা চাই ওসব ও করতো না তপু। আবদার করা, বায়না করা —এই ব্যাপারগুলো তপু শেখেইনি। একেবারেই না। বই-এর পোকা। বই কিনে দিলেই খুশি।

— আমার ছেলেটাকে বই কিনে দিতাম, ও ছুঁয়েও দেখতো না। বুবুটা খুব লাকি ছিল।

— যমুনা বলতো তুমি ওকে বুবু বলে ডাকতে। বুবু ডাকটা আমারও খুব পছন্দ।

— আসলে বুবু তো কোনও নাম নয়, বুবু হল দিদি।

নির্মলা হাসতে হাসতে বলে, জানি।

এভাবে কথা গড়াগড়ি খেতে থাকে। কী পোশাক পরতো যমুনা, শাড়ি ছাড়া আর কি কিছুই পড়তো না ! রঙ্গ রংটা ভালোবাসতো খুব এককালে ! শেষদিকেও কি নীল রংই ছিল ? বিদেশে তো বিদেশি পোশাক পরতো। কী খেতো ? সব খেতো। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতো খাবার নিয়ে। সে কী আর শুধু খাবার নিয়ে, পোকা-মাকড় নিয়েও, ইট-পাথর নিয়েও। সে কী আর আজ থেকে ! কে রাঁধতো ? কে আবার, বেশির ভাগ নির্মলাই। নির্মলাকে যমুনা কখনও আবদার বা অনুরোধ বা আদেশ করেনি ঘর সংসার আর রান্না-বান্না সামলাতে, নির্মলা যা করেছে ভালোবেসেই করেছে। অবসরে কী করতো, অবসর বলে সত্যি কি কিছু ছিল ? হ্যাঁ ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। বই পড়তো। বেড়াতো। তবে বই পড়া আর বেড়ানোকে যমুনা খুব জরুরি কাজ বলেই মনে করতো। এদুটোর কোনও একটিকেও এন্টারটেইনমেন্ট হিসেবে নেয়নি। যেন শিখছে এসব থেকে। বই পড়তো লাল কালিতে দাগিয়ে দাগিয়ে, মার্জিনে লিখতো নানা কিছু। আর বেড়াতে গেলেও হাতে একটা নোট বই থাকতো, নতুন জায়গায় নতুন কী দেখলো, নতুন কোনও লোকের সঙ্গে নতুন কী কথা হল, নতুন কী খেলো, নতুন কী শুনলো, এসবের অনেক কিছু লিখে রাখতো, আবার হঠাৎ হঠাৎ নিজের কিছু একটা মনে হলে, যেকোনও কিছু নিয়েই, লিখতো। নির্মলা বলতো, মাথাই তো আছে মনে রাখার, কাগজে লেখার দরকার কী ! যমুনা হেসে বলতো, মাথাকে অত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস করতে নেই, কখন আবার সবগুলিয়ে ফেলে বা ভুলিয়ে ফেলে, বলা যায় না। কাউকে কি বিশ্বাস করতো যমুনা, মানুষ কাউকে, নূপুর প্রশ্ন করে। নির্মলা বলে, করতো, অনেককেই করতো, যেমন নির্মলাকে করতো, ভীষণ বিশ্বাস করতো। নূপুর আর জিজ্ঞেস করেনি নূপুরকে করতো কিনা বিশ্বাস।

কারা বন্ধু ছিল, মুন আর গার্গী যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নূপুরের, কেমন আছে ওরা। নির্মলা ধীরে ধীরে নূপুরের সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। যমুনার চেনা পরিচিতর সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় খুব আগ্রহী কখনও নয়। বাড়িতে যে হৈচৈ-আড্ডা হত না, তা নয়। বেশির ভাগই হত নির্মলার কারণে। নির্মলার ওপর যমুনা ভীষণ নির্ভর করতো। নির্মলা ডাকবে বন্ধুদের, আপ্যায়ণ করবে। নিজে কি যমুনা কিছুটা অন্তর্মুখী ছিল ! না নির্মলার তাও মনে হয় না। তবে আড্ডা মানেই, যমুনা মনে করতো না, মন ভরে কারও নিন্দা করা অথবা কারও গুণকীর্তণ করা আর কিছুক্ষণ পরপরই কথা নেই বার্তা নেই গান গেয়ে ওঠা। নূপুর এত দেখেছে যমুনাকে, তারপরও নির্মলার চোখে আবার নতুন করে দেখে। এত চেনে সে তাকে, তারপরও নির্মলার মতো করে আবার চেনে। নূপুরের ভালো লাগে শুনতে যে যমুনা যে কোনও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতো ভীষণ, সোলার সায়েনটিস্টদের সঙ্গে কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করাকে যে রকম গুরুত্ব দিত, সিস্টারহুডের অল্প শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গেও আলোচনা করাকে একই রকম গুরুত্ব দিত। তখনও পেছনে খরচ তেমন হয়নি বলে সিস্টারহুড চালানো সম্ভব হয়েছে। প্রথম প্রথম যমুনাকে প্রচুর টাকা ঢালতে হত, সদস্যদের চাঁদায় কুলোতো না। এখন সিস্টারহুড নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। নির্মলার ঠিক যেন এরকমই একটা সংগঠনের দরকার ছিল। আর দরকার ছিল যমুনার মতো একজন পথ প্রদর্শকের বা বন্ধুর। শুনতে শুনতে নূপুর ভাবে এ যমুনা নতুন কেউ, অচেনা কেউ, তার এতকালের চেনা দিদি নয় বা বুবু নয়।

কণ্ঠস্বর শান্ত, দুজনেরই। রাত দশটায় শুরু হয়, কথা রাত দেড়টায় শেষ হয়। দুজনই শুয়ে, দু'দেশে। কথা হয় একজনকে নিয়ে, যে নেই। যে মৃত, সে বেঁচে থাকা মানুষকে ঘনিষ্ঠ করতে থাকে, নিজের লোক করে যেতে থাকে। যে মৃত সে-ই যেন জীবিত সত্যিকার। আর যারা তাকে ভালোবাসছে, তারাই শোকে মুহ্যমান, তারাই মৃতবৎ, তারাই মৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলার কাছে যমুনার জীবন-যাপনের কথা শুনতে শুনতে নূপুরের মনে হয় অনেকগুলো বছরের দূরত্বকে ভেঙে চুরে, দু'দেশের মাঝখানের কাঁটাতারকে ছিঁড়ে ছুঁড়ে যমুনা বাতাসের চেয়েও বেগে, আলোর চেয়েও দ্রুত, সব ছাপিয়ে, সব মাড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় বুঝি যমুনা এই বাড়িতেই আছে, এই বাড়িতে যেন দু'বোন শৈশব আর কৈশোরের সেই দুরন্ত দিনগুলো আর বছরগুলো কাটাচ্ছে। যমুনা যেমন কাছে ছিল, সারাক্ষণ কাছে ছিল, তেমনই কাছে আছে, সেই আগের মতো আছে। যেন তাকেই নূপুর শুনছে এখন, যেমন শুনতো। যমুনাময় জীবন ছিল নূপুরের। জন্ম হওয়ার পর যমুনাকে দেখেছে, যমুনার কাছেই নিজের শৈশব কৈশোর যৌবনে শিখেছে অনেককিছু, হয়তো সবকিছুই। হয়তো সব শিক্ষাই জীবনে প্রয়োগ করতে পারেনি, তাতে কী, ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় আছে, এখনও আছে, নূপুরের বিশ্বাস আছে, কেবল নাড়া পড়লেই ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়বে যুদ্ধের সৈনিকের মত। শুধু তো যমুনাই ছিল না, আত্মীয়স্বজন ছিল, কিন্তু যমুনা যেভাবে ছিল, সেভাবে নূপুরের জীবনে কেউ ছিল না। যমুনা আবিস্কার করতো, নতুন কথা বলতো, নূপুর গ্রহণ করতো। সব সময় হয় তা গ্রহণ করতো না, তর্ক করতো কিন্তু ভেতরে ভেতরে মানতে তাকে হতই যে যমুনা যা কিছুই বলে, তা-ই নূপুরকে জানায়। নূপুর ফেলে দেয় অনেক কথা ছুঁড়ে, কিন্তু খুব বেশি দূর ছুড়তে পারে না। এক সময় কুড়িয়ে আনতে হয়, কুড়িয়ে এনে নিরালায় বসে নাড়তে হয় ভাবনাগুলো।

দিনগুলো যেন হাতের মুঠোয়। সেই দিনগুলো। এক সঙ্গে বড় হওয়ার দিনগুলো। যমুনা কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই সেই দিনগুলোর কথাই বলতো। দেখে মনে হত কী একটা ঘোরের মধ্যে আছে, বলতো, 'জীবনে পারলে যে করেই হোক ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের ওই বাড়িতে আমি যাবোই। আগের মতো আবার সেই বাবা-মা, আবার সেই ইনোসেন্ট দাদা আর বোকা বোকা নূপুরকে ওই বাড়িতে আমার চাই'। নূপুর বলেছে, 'যা গেছে তা গেছে। অতীত নিয়ে এভাবে পড়ে থেকো না। দাদাও আর ইনোসেন্ট নেই, আমিও আর বোকা নই'। যমুনা হেসে বলেছে, আসলে 'সুখের স্মৃতি বলতে আমার ওই টুকুই। স্মৃতির জাবর কেটে কেটে স্মৃতিকে বাঁচাই'।

যমুনার কথা বলতে বলতে কেঁদেছে নির্মলা। নূপুর কাঁদেনি। অনুভব করেছে বড় একটা পাথরের তলায় চাপা পড়েছে সে। বুকের ওপর বড় একটা পাথর, চাইলেই যে পাথরকে ঠেলে সরানো যায় না।

পরদিন ঢাকায় নূপুর একটা হোটেলে উঠেছিল, নাইমের বাড়িতে ওঠেনি। নাইমকে জানায়নি যে সে ঢাকায়। ইচ্ছে করেনি জানাতে। শেষ যা কথা যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে দুজনের, তারপর নাইমের মুখোমুখি হওয়াটা, নূপুরের মনে হয়নি, উচিত।

— শোন, আমিই যাবো। তুই অফিসিয়াল ব্যাপারগুলো পারবি না। ওর অ্যাড্রেসটা বল।

— অফিসিয়াল ব্যাপার মানে ?

— ডেথ সার্টিফিকেট বার করা। ব্যাংকের টাকা-পয়সাগুলো ট্রান্সফার করা। বাড়ি টাড়ি যা আছে বিক্রি করা। জিনিস-পত্রগুলো সর্ট আউট করা। বডি মেডিকেলে দেওয়া, নানা রকম কাজ। এসব পারবি না। ওখানে লোকেরা লুটে খাবে ওর সব কিছু।

— আমি পারবো। তোমার অত চিন্তা করার দরকার নেই। ওখানে লোক আছে আমাকে হেল্প করার।

— ভাব দেখাচ্ছিস যমুনার ওপর অধিকার একার তোর। তা কিন্তু নয়। যমুনার সহায় সম্পত্তি টাকা-পয়সার ভাগ আইনত আমি পাবো। আমি ভাই। ভাইরা পায়। বোনরা পায় না। ওর অ্যাড্রেস দে।

— ভুলে যেও না ওর একটা মেয়ে আছে। যা পাবে ওর মেয়ে পাবে। আর বুবু যদি উইল করে গিয়ে থাকে, তাহলে আর কথাই নেই। এদেশে উইল না চললেও ভারতে তো উইল চলে। বাবার সব কিছু নিয়েছো। বুবুর টাকা-পয়সায় দয়া করে লোভ করো না। ওর মেয়েকে কিছু পেতে দাও। তোমার লোভের কারণে নিজের বাপের সম্পত্তি আমরা দুবোন পেলাম না। এখন তপুকেও বঞ্চিত করো না। তোমরা পুরুষেরা অনেক কায়দা-কানুন জানো, বুবুর যদি কিছু থাকে, জানিনা আদৌ কিছু ছিল কিনা, নাকি ধার করে চলতো, তুমি সব আত্মসাৎ করতে পারবে, তোমার সেই ক্ষমতা আছে। কিন্তু দয়া করে এবার নিস্তার দাও। লেট হার রেস্ট ইন পিস।

— ওর পিস তো আমি নষ্ট করছি না। যত ইচ্ছে পিস ও ভোগ করুক। কিন্তু আইনের তো ব্যাপার আছে। তুই লিগ্যালি আমার বোনের হোয়ার অ্যাবাউটস জানার আমার যে রাইটস, তা ভায়োলেট করতে পারিস না। আজকে সে ডেড। আমার এখন দায়িত্ব তার কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এটা ভাই হিসেবে আমার ডিউটি। ওর মেয়ে ইন্ডিয়ায় নেই। সুতরাং সৎকার-টৎকার যা করতে হবে, আমাকেই করতে হবে।

— সরি। বুবু বলে গেছে, লিখে গেছে। বডি থেকে যে যে অরগান তুলে নেওয়ার সেগুলোও নেওয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু গিয়ে বডিটা মেডিকেলে দিয়ে আসতে হবে। সেটা করার জন্যই যাবো। একবার শুধু সেই মুখটা হাতটা ছোঁয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের কণ্ঠস্বর তখন মেঘলা হয়ে আসে।

— সেটা করতে তোর একার যেতে হবে কেন। আমি সঙ্গে যাবো। আর তুই যদি একা যাস, তোর নিশ্চয়ই অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

— যত যাই বলো না কেন দাদা, আমি তোমাকে সঙ্গে নেবো না।

— আমার দু'মিনিট লাগবে যমুনার অ্যাড্রেস বার করতে। কলকাতা শহরে কি আমার লোক নেই ভেবেছিস ? যমুনা কোথায় থাকতো কী করতো, ভেবেছিস এসব আমার কানে আসেনি ? কিছুই বলিনি তোদের। সব জানি। ওখানে তার সব রকম কার্যকলাপের কাহিনী আমার জানা। দু'মিনিট লাগবে।

— ভালো কথা। দু'মিনিটে তুমি ওর ঠিকানা বার করে ওর বাড়িতে যাও। তোমার বোন মরে পড়ে রয়েছে। যাও তার ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা যা আছে নিয়ে এসো। তোমার কাজে লাগবে। আমি যদি যাই আমি যাবো বুবুকে একটু চোখের দেখা দেখতে। শেষ দেখাটা দেখতে। মেডিকেলের কাটা-ছেঁড়া হওয়ার আগে।

নূপুর ফোন রেখে দেয়। তার ভয় হতে থাকে, নাইম হেন কিছু নেই যে না করতে পারে। নূপুরের ইচ্ছে করে পালাতে, নাইম যে শ্বাস ফেলছে, সেই শ্বাসে আগুন, পুড়ে ছাই করে দিতে পারে। নিজেকেই বলে সে বারবার, পরিবারের লোক হলেই পরিবারের কারও মৃত্যুর খবর তাকে জানতে হবে, এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

নিজেকে বাঁচাতে নূপুর দেশ থেকে চুপিচুপি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কাউকে জানায় না সে কবে যাচ্ছে, কখন যাচ্ছে। ঢাকায় শুধু নাইমের নয়, নূপুরের কাকার, মামার, কাকাতো-মামাতো-খালাতো ভাই-বোনদের বাড়ি। কারও বাড়িতে সে ওঠে না। কবে মারা গেছে যমুনা, কেন মারা গেছে, দেশ ছেড়েছিল কেন, বিয়ে না করেই তো বাচ্চা নিয়েছিল, বাচ্চার বাবা কে ছিল— এ সব প্রশ্ন করে নূপুরের মুখের দিকে সব আত্মীয়রাই যে হ্যাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, নূপুর বেশ জানে। অনেক দিন বিদেশে বাস করেছে সে, তাই বলে দেশের কৌতূহল যে কী রকম মাত্রা ছাড়া তা এখনও ভুলে যায়নি।

নূপুরের পাসপোর্ট আমেরিকার। ভারতের ভিসা পেতে খুব দেরি হয়নি, ভিসার লম্বা লাইনে অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। একা একাই করেছে সব। কারও সাহায্য সে চায়নি। বেশ কয়েক বছর হল নূপুর কোনও কিছুতেই কারও সাহায্য আর চায় না।

যে দিন যাচ্ছে নূপুর, সে দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে সে। কপালের সামনে ক'টা পাকা চুল। দু'আঙুলে হেঁচকা টান দিয়ে পাকা চুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক এক করে তুলতে থাকে নূপুর। নূপুর চুল পেকেছে দেখলে যমুনার নিশ্চয়ই মনে হবে খুব বুড়ো হয়ে গেছে নূপুর। চিরকালই ছোট বোনকে সেই ছোট বেলার ছোট বোনই মনে হয়। ছোট বোনদেরও যে বয়স বেড়ে পঞ্চাশ পেরোতে থাকে, অনেক সময় ঠিক বিশ্বাস হয় না। নূপুর ভালো একটা শাড়ি পরলো, যমুনা যে রকম শাড়ি পছন্দ করে। সাজলো অনেকক্ষণ ধরে। কপালের চুলগুলোও নেই, ঠোঁটে লিপস্টিক পরলো, কপালে একটা লাল টিপ পরলো। চোখে কাজল, ভ্রু আঁকলো। মুখে মাখলো ময়ইশ্চারাজার, ফাউন্ডেশন, পাউডার। পারফিউম মাখলো সারা শরীরে। আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে যখন দেখে নিজেকে, নূপুরের চোখ দিয়ে নয়, দেখে যমুনার চোখ দিয়ে। নিশ্চয়ই নূপুরকে দেখে খুশি হবে যমুনা। নিশ্চয়ই হাসবে সেই অসাধারণ হাসি। হঠাৎ নূপুর চমকে ওঠে। একী ভাবছে সে। এ কেন ভাবছে সে। কী ভেবে এতক্ষণ ধরে সে সাজলো। যমুনা তো নেই। একটা আর্তচিৎকার তার কণ্ঠ চিরে বেরোতে থাকে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে নূপুর। উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

হোটেলের রুমে ফোন বাজে, নিচে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বিমান বন্দরে যাওয়ার ট্যাক্সি।

যমুনা মারা যাওয়ার তিন দিন পর নূপুর বাংলাদেশ বিমানে আধ ঘন্টার উড়ান দূরত্বে পৌঁছোলো কলকাতায়। দমদম বন্দরে দাঁড়িয়ে ছিল নির্মলা। নির্মলাকে চিনতে নূপুরের কোনও অসুবিধে হয় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমঘর

হিমঘরে শুয়ে আছে যমুনা। চোখের সামনে মৃতদেহ দেখেও নূপুরের মনে হতে থাকে এ সত্য নয়। এ ঘটেনি। যমুনা আছে, বেঁচে আছে। কোথাও আছে। এই মৃতদেহ, এই হিমঘর—সবকিছু ঘটছে হয়তো অন্য কোথাও, স্বপ্নে অথবা অন্য কোনও জগতে। এই পৃথিবীর বাস্তবতার সঙ্গে হয়তো সম্পর্ক নেই কোনও। 'নূপুর তুই এলি, শেষ পর্যন্ত এলি ! আয় কাছে আয়, আয় আরও কাছে'। নূপুর অনুভব করতে থাকে যমুনার স্পর্শ। দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টানা, ভালোবাসায় মমতায় স্নেহে জড়িয়ে রাখা। কতকাল এই স্পর্শ সে পায়নি। কে করে আর তাকে ওভাবে আলিঙ্গণ, যমুনার মতো ! জগতটা তারপরও হঠাৎ চরকির মতো ঘুরে ওঠে। কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়। আবারও ঘোরে। আবারও শান্ত হয়। একটি মৃত্যুকেই শত শত মৃত্যুর মতো মনে হয় তার। যেন সে অন্ধকারে কোথাও শহরের এক ক্যাটাকম্বের মধ্য দিয়ে হাঁটছে, দু'ধারে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথার খুলি আর হাড় থরে থরে সাজানো। নূপুর হাঁটছে মাঝখানের সরু অন্ধকার পথে, কোথাও কেউ বাতি হাতে তার জন্য দাঁড়িয়ে নেই।

হিমঘরে যমুনার শরীর ওভাবেই পড়ে থাকে, যেভাবে পড়ে ছিল। নূপুর ফিরে আসে যমুনার বেহালার বাড়িতে। কলকাতায় যমুনার সঙ্গে দেখা করতে নূপুর যখন এসেছিল, তখন যাদবপুরের দিকে কোথাও থাকতো যমুনা। বেহালার এই বাড়িতে যমুনা কতবার আসতে বলেছে তাকে। এলো ঠিকই। যমুনার শুধু দেখা হল না যে এলো। কুড়ি বছর যমুনা কলকাতায় থেকেছে। কুড়ি বছরে কুড়িবারেরও বেশি নূপুর বাংলাদেশে এসেছে। ঢাকায় বা ময়মনসিংহে অলস অবসর কাটিয়েছে, কিন্তু যমুনার সঙ্গে দু'বার শুধু দেখা করতে এসেছে, একবার ত্রিবান্দ্রামে, আরেকবার কলকাতায়। ফোনে যতবারই কথা হয়েছে, যমুনা বলেছে 'টিকিট পাঠাচ্ছি চলে আয়, দু'বোনে ক'টা দিন কাটাই চল, খুব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো লাগবে এখানে দেখবি, তোকে অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো, পাহাড় ভালো লাগে না তোর ?' এরকম প্রশ্নের উত্তরে নূপুর 'না গো, জয়ের পেটটা খারাপ বা জ্বর হয়েছে বা জয়ের ইস্কুল আছে, তাড়াতাড়ি নিউইয়র্কে ফিরতে হবে,' অথবা 'সময়ই তো পাচ্ছি না, অথবা তোমার সঙ্গে তো ফোনে বা নেটে কথাই হয়', বা 'এই গরমে কোথাও আর জার্নি করতে ইচ্ছে করছে না, এবার বাদ দাও, সামনের বছর ঠিক ঠিক যাবো। আর তুমি তো যাবেই নিউইয়র্ক তখন তো দেখা হবেই' বলেছে। যমুনার আবেগের জলে ঝাঁকা ঝাঁকা ছাই ঢেলে দিয়েছে। অপরাধবোধ আজ নূপুরকে স্তব্ধ করে রাখে। সেই স্তব্ধতাকে আলতো করে স্পর্শ করে নির্মলা।

— কী, এত কী ভাবছো ?

নূপুর বিষণ্ন মাথা নাড়ে। নাহ কিছু না।

তাকায় সে নির্মলার দিকে। কত হবে বয়স ! সম্ভবত চল্লিশের কাছাকাছি। পিঠে দুলছে লম্বা ঘন চুল। ফর্সা মুখ। পরনে কালো পাড় সাদা শাড়ি, কপালে বড় লাল টিপ। লম্বায় নূপুরের চেয়ে ছ'ইঞ্চি মতো ছোট। নূপুর আর যমুনা দুজনই পাঁচ ফুট সাড়ে আট। দু'জনেই ছিপছিপে, দুজনকেই চোখে পড়ে, তবে যমুনাকে বেশি পড়ে। সে কী আজ থেকে !

নির্মলা বলে, 'আমি বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট কি আমারও কম হচ্ছে !'

নূপুর জানে না যারা যমুনাকে শৈশব, কৈশোর আর যৌবন জুড়ে দেখেনি, তাদের কষ্ট আদৌ কোনও কষ্ট, অথবা তাদের কষ্ট কোনও গভীর কষ্ট কি না !

নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে যমুনার কয়েকজন বন্ধু আর সহকর্মী আসে বাড়িতে। ড্রইংরুমে বসে চা খেতে খেতে ওরা যমুনার কথাই বলে। যমুনা কেমন ছিল, কী ছিল, কেন হঠাৎ এমন হল, ভালো মানুষগুলোই কেন এভাবে আগে চলে যায়। ওদের কণ্ঠস্বরে উথলে উঠতে থাকে যমুনাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস আর যমুনার না থাকার বেদনা। চারদিকের পরিবেশ নতুন, মানুষগুলো নতুন, ভাষা এক হলেও ভাষার ব্যবহার ভিন্ন। নূপুর শোনেই বেশি। ওদের কিছু মামুলি প্রশ্নের উত্তর মলিন মুখে দেয়। নূপুরের কথা সবাই যমুনার মুখে শুনেছে। নূপুরকে দেখার ইচ্ছে ছিল সবার। আলাপের সুযোগটা কেউ ছাড়তে চায়নি। নূপুরের কষ্টে সান্ত্বনা দিতেও আসা। 'নূপুর একেবারে দিদির মতো দেখতে, দিদি যে কী ভালই বাসতো বোনকে !' 'ক'দিন আগে এলেই দেখাটা হতে পারতো, কী যে খুশী হত যমুনা !' 'আহ, কষ্টটা যে কী ভীষণ !' এসব বলে কয়েকজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে ভিড় কমতে থাকে। নূপুর বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দরজা জানালা বই-পত্র, চেয়ার-টেবিল, বিছানা-বালিশের দিকে। বাড়িটাতে কিছুদিন আগেই একটা মানুষ ছিল, মানুষটা নেই। মানুষটা কখনও আর ফিরে আসবে না। কখনও আর যাপন করবে না জীবন, আগের মতো। নির্মলা রাতের খাবার টেবিলে সাজিয়ে নূপুরকে ডাকে। নূপুর চা টা খায়। ভাত তরকারি খেতে তার ইচ্ছে করে না। পুরোনো দিনগুলো তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। স্মৃতি ছেকে ধরে। উদাস হতে থাকে নূপুর। ঘুমহীন সারারাত। নির্মলার প্রশ্নের উত্তরে হুঁ হাঁ ছাড়া আর কিছু বলে না। যে শাড়ি পরে এসেছিল, সেই শাড়ি পরেই শুয়ে থাকে। মুখ হাত ধোয়া, বাড়িটা ঘুরে দেখা, নির্মলার সঙ্গে কথা বলা, কিছুই সে করে না। নির্মলা বাধা দেয় না। একেক জনের শোক করা একেক রকম। খাবো না, ঘুমোবো না, কথা বলবো না, এই আচরণ নির্মলার নয়। নির্মলা প্রতিদিন ভোরে যমুনার ছবিতে তাজা ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। দোতলার বারান্দায় বসে আগে যেমন গান গাইতো, তেমন বসে এখনও গান গায়। পাশে যমুনার চেয়ারটা যেমন ছিল, থাকে। স্নান করে এরপর নির্মলা আপিস চলে যায়। সন্ধ্যেবেলায় ফিরে বাচ্চাদের পড়াতে বসে। চণ্ডিতলা থেকে পঞ্চাশ ষাটটা পাঁচ ছ' বছর বয়সী গরিব বাচ্চা মেয়ে আসে বাড়িতে, নির্মলা ওদের বাংলা ইংরেজি অংক বিজ্ঞান পড়ায়। পড়ানো হয়ে গেলে সবাইকে কোনোদিন রুটি বিস্কুট কোনোদিন কলা ডিম এরকম নানা কিছু দিয়ে দেয়। এ কাজটি যমুনাই শুরু করেছিল। শেষ দিকে নির্মলার ওপর দায়িত্ব পড়েছে। যমুনা বলেছিল তার অনুপস্থিতিতেও যেন এই বাচ্চা পড়ানোর কাজটা চলতে থাকে বাড়িতে। নূপুর জিজ্ঞেস করেছিল, সিস্টারহুডই তো দায়িত্ব নিয়েছে গরিব বাচ্চাদের পড়াশোনা করানোর। তবে আর বাড়িতে একই কাজ করার দরকার কী ! নির্মলার কথা, কয়েক লক্ষ ইস্কুল খুললেও কয়েক কোটি গরিব থেকে যায় যারা পড়াশোনা করার সুযোগ পায়না। যমুনার সব আদেশ উপদেশ নির্মলা মাথা পেতে বরণ করেছে। বাড়িতে মেয়ে পড়ানোর কাজটা ছাড়েনি এই দুর্যোগেও। অবশ্য যমুনার চলে যাওয়া আর নূপুরের আসা— এ দুটো কারণে অফিসে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে নির্মলাকে।

পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে নূপুর বাড়িটা খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে দেখে। হলুদ দোতলা বাড়ি।ওপর তলায় তিনটে শোবার ঘর। দক্ষিণে বারান্দা। নিচ তলায় ড্রইং রুম, রান্নাঘর, খাবার ঘর, সামনে পেছনে দুটো বারান্দা। সামনের বারান্দা পেরোলে ফুল ফলের বাগান। আর পেছনের বারান্দা পেরোলে শাক সবজির বাগান। ফুল ফল আর শাক সবজির বাগান দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে। যেন এ বাগান কলকাতার কোনও বাড়ির বাগান নয়, এ ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের বাড়ির বাগান। ঠিক এভাবেই তার মা, যমুনার মা, বাগান করতো। ঠিক এই ফুলফল গাছগুলো, ঠিক এই সবজি শাক ছিল তাদের বাগানে। নূপুর আনমনে হাঁটে। ভোরের হাওয়া তার আঁচল উড়িয়ে নেয়, তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় বারবার। এ কি ব্রহ্মপুত্রের হঠাৎ হাওয়া ! ভোরগুলো দেখতে খুব সুন্দর। নূপুর কতদিন ভোর দেখে না। চোখ বুজলেই সে যেন শুনতে পেল, পেছন থেকে বলছে যমুনা, 'কতদিন পর এলি নূপুর। কী যে ভালো লাগছে তুই এসেছিস। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানটা আজও করা হয়নি, তুই এলে করবো ভেবেছিলাম। আজ আমরা মুড়ি ভাজা আর চা খেতে খেতে অনেক গল্প করবো, কেমন ? আজ অফিস যাবো না। তুই এসেছিস, তোকে নিয়ে সারাদিন। তোকে নিয়ে সারারাত'। নূপুর উঠে আসে সবজি বাগান থেকে রান্নাঘরের রেফ্রিজারেটরের দিকে। তেষ্টা পাচ্ছে তার। জল চাই। লক্ষ্য করে স্নাত, স্নিগ্ধ নির্মলা, সাদা শাড়ি কালো পাড়, কপালে কালো টিপ, মুখে স্মিত হাসি, দরজা-জানালা যত আছে সব খুলে দিয়ে উঠোনে চলে গেল, ফিরে এলো আঁচল ভরে ফুল নিয়ে। রান্না ঘরের পাশে ছোট একটা পুজোর ঘরে ঢুকলো। নূপুর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে নির্মলার পুজোর ঘর, ছোট ছোট কাসার বাটি গেলাস, জবাফুল, বেলফুল। ছোট ছোট নানা মূর্তি, পাশে যমুনার একটি ছবি। মূর্তিগুলোর সামনে তাজা ফুল, যমুনার ছবির সামনেও। ছবির কপালে চন্দন আর সিঁদুরের ফোঁটা। দু'হাত জড়ো করে নির্মলা মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই পুজো করাটা কিছুক্ষণ দেখে নূপুর উঠোনে গিয়ে আবার আগের মতো হাঁটে। ধর্ম টর্ম কোনওদিন মানেনি যমুনা আর তার বাড়িতেই কি না দেব দেবীর ভিড় ! নিজের গুণগান গাওয়াও সে পছন্দ করতো না, আর কি না তার বাড়িতেই তাকে পুজো করা হচ্ছে ! নূপুর ঠিক বুঝে পায় না, এসব কবে হল, কী করে হল। এ বাড়ি কী করে চলবে, এ বাড়িতে ধর্মকর্ম চলবে কী চলবে না, সেই সিদ্ধান্ত কি অন্য কেউ নিত, যমুনা নিত না ? যমুনা কি শেষ দিকে নিজের বিশ্বাস থেকে তবে সরে গিয়েছিল ?

শিউলি ফুলের গন্ধে সারা পাড়া মনে হয় মাতাল হবে। নূপুর শিউলি কুড়োয়। সেই ছোটবেলায় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের বাড়িটার সামনে সবুজ মাঠটা শিউলি পড়ে সাদা হয়ে থাকতো, নূপুর আর যমুনা ভোরবেলা শিউলি কুড়োতো। শিউলি কুড়োনোর সময়ই গানের শব্দ ভেসে আসে। সুর অনুসরণ করে দোতলায় উঠে বারান্দায় বসা নির্মলার গাওয়া গানটা শুনতে থাকে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া, চারদিকের সবুজ আর নির্মলার 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...' ! নূপুর পাশের চেয়ারটায় বসে.যমুনার চেয়ারটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান শেষ হলে নূপুর মুগ্ধ কণ্ঠে বলে, 'বাহ তুমি তো খুব ভালো গান গাও'।

— 'এক সময় শিখতাম। সেই ছোটবেলায়'।

মিষ্টি হাসি মুখে নির্মলার।

-'চর্চাটা রেখেছো'।

— 'তা রেখেছি। যমুনাদির অনুরোধে গাইতে গাইতে এখন গাওয়াটা রিচুয়ালের মত দাঁড়িয়ে গেছে। যেন না গাইলে দিন শুরু হবে না। প্রায় দু'বছর ধরে এই বারান্দায় বসে সকাল সন্ধ্যায় গাইছি। যমুনাদি ঠিক এখানে বসতো। আজ তুমি বসে আছো। তোমাদের দুজনে দেখতে এত মিল' !

— 'বল কী ! আমরা তো জানি কোনও মিল নেই'।

— 'আমি তো মিল দেখছি'।

— 'আমি আর বুবু জানতাম কোনও মিলই নেই। বাইরের লোকেরা কেন মিল পায় ঠিক বুঝি না। যাই হোক...বুবু গান তো সেই ছোটবেলা থেকেই ভালোবাসতো। রবীন্দ্রসঙ্গীত। গাইতোও তো'।

— 'আমি গাইলে গুন গুন করতো, কিন্তু গাইতো না'।

— 'আর একটা গান গাও তো প্লিজ'।

— 'কোনটা গাইবো বলো। তোমার ভালো লাগার একটা গান বলো।

— 'ওই যে ওই গানটা গাও না। যমুনাদির মানে বুবুর খুব পছন্দের গানটা। 'আমি কান পেতে রই'। শান্তিদেব ঘোষের গলায় গানটা অদ্ভুত সুন্দর লাগতো। কোনও মিউজক ছাড়া গানটা। বুবু গাইতো'।

— 'এটা যে কত গেয়ে শুনিয়েছি যমুনাদিকে'।

নির্মলা গাইতে শুরু করে গান। এই গান নূপুরকে আবার ব্রহ্মপুত্রের জলে সাঁতার কাটায়। গান গাইতে গাইতেই নির্মলা নূপুরের একখানা হাত হাতে নেয়। দুজনই গানের মসৃণ সিড়ি বেয়ে পৌঁছে যায় যমুনার কাছে, অন্তত এরকম মনে হয় যে পৌঁছে গেছে। মানুষ কত দূরে চলে যায়, তবু মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দূরত্বেই বুঝি আছে।

গান শেষ হলে হাত দুটো শিথিল হয়ে আসে। নূপুর জিজ্ঞেস করে— 'তোমার কাছে সুই সুতো আছে ?'

— 'কেন গো ?'

— 'শিউলি ফুলের মালা গাঁথবো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা হেসে বলে, 'আমার কাছে দাও, আমি গেঁথে দিচ্ছি'। যমুনাও ঠিক এভাবে শিউলি ফুলের মালা গাঁথতে বলতো। — 'তোমাদের দু'জনে মিল নেই তো কাদের মিল আছে বল ?'

— 'তোমার সঙ্গে মিলতো না ?' নূপুর জিজ্ঞেস করে।

নির্মলা হাসতে হাসতে বলে, 'পাগল হয়েছো ? নিজের দিদিকে চেনোনা ? আমি আর তোমার দিদি দু'জন দু'মেরুর মানুষ'।

— 'দু মেরুর হয়ে কী করে এতকাল একসঙ্গে থেকেছো ? ঝগড়া হতো না ?'

— 'মোটেও না। কারণ আমরা জানতাম আমরা দু'মেরুর। কেউ কাউকে কনভার্ট করার চেষ্টা করিনি'।

— 'কমন গ্রাউন্ডস কী ? কিছু তো থাকতেই হয়, তাই না ?'

— 'আছে নিশ্চয়ই কিছু। অথবা না থাকলেও হয়তো চলে। বিশ্বাসে আদর্শে মেলে এমন লোকদের সঙ্গে দেখেছি যমুনা তুমুল ঝগড়া করছে, কিন্তু আমার সঙ্গে করছে না'।

— 'সম্ভবত তুমি খুব মানিয়ে চলতে'।

নির্মলা বলে, 'মানিয়ে চলা যদি আমার চরিত্র, তবে সে একেবারে ইনবিল্ট। এ তোমার দিদির জন্য আমি চেষ্টা করিনি'।

নির্মলা উঠে গিয়ে সুই সুতো নিয়ে শিউলির মালা গাঁথতে থাকে। এভাবে সে যমুনার জন্যও মালা গাঁথতো। নূপুর জিজ্ঞেস করে,

— 'বুবু তোমাকে সব কথা বলতো ?'

— 'জানিনা সব বলতো কি না। তবে অনেক কিছুই বলতো। কেন বলো তো ?'

— 'না। এমনি। কতদিন চেনো বুবুকে ?'

— 'প্রায় ষোলো বছর'।

— 'অনেক দিন'।

— 'হ্যাঁ অনেক দিন'।

— 'আচ্ছা তুমি বুবুকে যমুনা বলে ডাকতে নাকি যমুনাদি ?'

— 'কখনও যমুনা, কখনও যমুনাদি। কখনও নদী। কখনও যা ইচ্ছে'।

— 'তুমি তো বয়সে বুবুর চেয়ে ছোট অনেক'।

— 'তাতে কী ! বয়স হল তুচ্ছ সুতো, ইচ্ছে করলে ডিঙোনো যায়। ভালোবাসায় বয়স কী গো ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক। তার ভালো লাগছে দেখতে একটা জলজ্যান্ত মানুষ তার দিদিকে ভাবছে, তার জন্য কাঁদছে, তাকে ভালোবাসছে। এরকমও তো হতে পারতো যে নূপুর খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখতে পেলো যমুনার খুব নিঃসঙ্গ জীবন ছিল, কেউ ছিল না ভালোবাসার, কেউ ছিল না পাশে বসার, দুটো কথা বলার, হাতে একটু হাত রাখার। যমুনা মরে পড়ে আছে, শরীর পচে গন্ধ বেরোচ্ছে। পুলিশের জমাদার এসে কোথাও শরীরটা ফেলে দিয়ে আসছে। ভালোবাসা খুব চমৎকার জিনিস। চোখ বুজলেও নিশ্চিন্তে চোখ বোজা যায়। কেউ একজন রইলো আমার, এই অনুভূতিটা, নূপুর জানে, না থাকাটা কী রকম শ্বাসরুদ্ধকর।

নিজের শরীরটা যেমন ঝকঝকে, বাড়িঘর উঠোন বারান্দাও তেমন ঝকঝকে করে রাখছে নির্মলা। অবচেতনে তারও বোধহয় নূপুরের মতো বিশ্বাস হয়, যমুনা আছে, কোথাও না কোথাও আছে, হয়তো গেছে ঘরের বাইরে, ফিরে আসবে, ঠিক এক্ষুণি ফিরে না এলেও ফিরে আসবে। নির্মলাকে নিয়ে বোধহয় বেশ সুখে ছিল যমুনা, নূপুর ভাবে। কেউ একজন কাছে আছে, যে ভালোবাসে, এর চেয়ে বড় আর কী আছে একটা জীবনে ? কাছে তো কত কেউ থাকে। নূপুরের কাছে দীর্ঘকাল তো শুকত ছিল। তার চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো। যে ভালোবাসে না তার সঙ্গে এক বাড়িতে এক ঘরে বছরের পর বছর কাটানোর মতো ভয়ংকর আর কিছুই নয়।

— 'অনেকদিন কথা হয়নি তোমাদের'।

পায়রার ওড়াওড়ির দিকে, গাছের পাতার নাচের দিকে নূপুর তাকিয়ে থাকে উদাস। শিউলি ফুলের মালাটা নূপুরের হাতে দিয়ে নির্মলা বলে, 'আমার মনে হয় একটু অভিমানও ছিল তোমার ওপর। অনেকদিন জিজ্ঞেস করেছি, নূপুরের সঙ্গে কথা হয়েছে ? বলতো, নাহ, ও ব্যস্ত মানুষ। ওর কি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় হবে ! একবার ফোন করলেই তো পারো, না হয় ব্যস্ত, তাতে কী, তোমার সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলার সময় হবে না। একটা মানুষ কি চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকে ! তোমার চেয়ে ব্যস্ত লোক তো আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। নূপুর তোমার চেয়েও বেশি ব্যস্ত ! আমি বলেছি। কিন্তু যমুনাদি কি আমার কথা কখনও শুনেছে ! নিজে যা ভালো বুঝেছে, করেছে। আমার ওই কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, চিকি, আমার ডাক নাম চিকি, ভয়ে করি না, যদি বলে দু'মিনিট সময় হবে না'।

— আসলে আমাদের বেশির ভাগ কথা শেষদিকে ইমেইলেই হত। আর বছর পাঁচ আগে আমার জীবনে ওরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটার পর.. । জানো তো নিশ্চয়ই। জীবনটা ভীষণ পাল্টে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের একটা হাত নির্মলা তার হাতের মুঠোয় নিয়ে একটুখানি উষ্ণতা ছড়িয়ে বলে, জানি।

— কী জানি বুবুর পুরোনো নম্বরগুলো পাল্টে গিয়েছিল কি ! ফোন করেছিলাম কি এর মধ্যে ? হয়তো পাইনি।

— যমুনাদি তো পুরোনো নম্বর পাল্টাননি। আগের নম্বরই সব ছিল, এখনও আছে। ল্যান্ড, মোবাইল।

— ও। তাহলে জানিনা কেন।

অপরাধবোধের একটা কালো চাদর আচমকা নূপুরকে আপাদমস্তক ঢেকে দেয়। বড় একা বোধ করে সে। শিউলির সুঘ্রাণটুকু শুধু থাকে সঙ্গে।

যমুনা অফিসের কাজে আমেরিকায় বেশ কয়েকবার গেছে। যতবারই গেছে, নূপুরের সঙ্গে দেখা না করে আসেনি।

— তুমি তো একবার গেছ ত্রিবান্দ্রামে। সোলার পাওয়ার প্রজেক্টের জন্য কাজ করতো যমুনাদি। ওখানে তো সোলার পাওয়ারের ওপর একটা পিএইচডিও করছিল।

— বাহ তুমি তো দেখি সব জানো।

— সব জানি না। যতটুকু বলতো ততটুকু। সব বলতো কি ?

— 'আচ্ছা, কেরালায় একটা ক্রিশ্চান লোক, অদ্ভুত একটা নাম ছিল, সোজো ভারুগিজনাকি ভরুগিজওকে তো বোধ হয় বিয়ে করেছিল বুবু। একবার বলেছিল, এ দেশের সিটিজেন না হওয়ার কারণে নাকি কী সব অসুবিধে হচ্ছে, তাই বিয়ে করে যদি সিটিজেনশিপ নিতে হয়, তাই নেবে। বুবুর সিটিজেনশিপটা বোধ হয় ওই বিয়ের কারণে। জানিনা, আমার মনে হয়েছিল, বিয়েটা অনেকটা কনট্রাক্ট ম্যারেজের মতো। সেই কবে কার কথা ! তখন তপু ছোট। আর জয় এর তো জন্মই হয়নি'।

বিয়ের পর আমেরিকা থেকে শওকত আর নূপুর যখন বাংলাদেশে প্রথম বেড়াতে এল, নূপুরের একটাই দাবি ছিল তখন, সে ভারতে তার বুবুকে আর তপুকে দেখতে যাবে। শওকত নিজেই টিকিট করে দিয়েছিল, বিমান বন্দরে পৌঁছেও দিয়েছিল, আপত্তি করেনি। ত্রিবান্দ্রামে একা একা চলে গিয়েছিল নূপুর। ক'টা দিন নূপুরকে রানীর আদরে রেখেছিল যমুনা।

নির্মলা হেসে বলে— 'হ্যাঁ তা ঠিক। ভালই করেছিল। সিটিজেনশিপটা তাড়াতাড়ি করে নিয়েছিল বলে অত ভালো চাকরি করতে পেরেছে। কলকাতায় তো অগ্নি পাওয়ার যমুনাদির হাতেই গড়ে উঠেছে'।

— 'তাই বুঝি ?'

— 'বলেনি তোমাকে ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হয়তো বলেছিল, ঠিক মনে নেই।

দুজনই ওঠে। দুজনেরই চায়ের তেষ্টা পায়। চা নিয়ে দুজনই যমুনার শোবার ঘরে ঢোকে। বড় খাট। বড় সাদা চাদর বিছানো, বালিশের কভারগুলোও সাদা, সুন্দর। হালকা নীল সুতোর কাজ করা। ঘরে অনেকগুলো বড় কাঠের আলমারি। খাটের পাশে ছোট টেবিল। টেবিলে উঁচু হয়ে আছে বই। বসার ঘরের বইয়ের তাকগুলোয় রাশি রাশি বই। এত বই কখন পড়তো যমুনা ! নির্মলা শোবার ঘরের আলমারিগুলো খুলে দেখায় নূপুরকে।

'যমুনাদির কাপড়চোপড় সব এখানে। সব সময় তো শাড়িই পরতো। শাড়িই বেশি। তাছাড়াও কত যে তার রাজ্যির টুকিটাকি জিনিস আছে, অত আমি বুঝিও না। কোনও শাড়ি পছন্দ হলে তুমি পরতে পারো'। নূপুর ম্লান হেসেছে। যমুনার শাড়ি কত পরেছে নূপুর। ঢাকায়, ত্রিবান্দ্রামে, কলকাতায় সবখানেই। কখনও মনে হয়নি অন্যের শাড়ি। কোনওদিন কোনও অনুমতি নেয়নি পরতে গিয়ে। যমুনার জিনিসপত্রে নূপুরের অধিকার সেই শৈশব থেকেই ছিল। জিনিসপত্র পড়ে থাকে, মানুষ চলে যায়। নূপুরের বিশ্বাস হতে কষ্ট হয়, যে, যমুনা সত্যি সত্যি চলে গেছে।

নূপুর যমুনার বিছানাতেই শুয়েছিল কাল। চায়ে চুমুক দিয়ে বিছানায় বসে, পিঠের পিছনে বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে দেয়ালে, নূপুর বলে, 'তোমার ঘরটা কোথায়, পাশেরটা ?'

-'এই ঘরটাই আমাদের দুজনের শোবার ঘর'।

— 'তোমরা এক বিছানায় শুতে ?'

নির্মলা জোরে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে— 'তাহলে কি দু'বিছানায় শোবো !'

নূপুর নির্মলার নির্মল হাসি ঝিলমিল করে।

— 'না, আসলে বুবু তো অন্য কারও সঙ্গে শুতে পারতো না'।

-'কে বললো শুতে পারতো না। বেশ পারতো !'

নূপুর বলতে গিয়েও বলেনি যে যমুনা তপুর ছোট বয়সে যমুনা তপুকে নিয়েও শোয়নি। বরং দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টায়। কারণ নির্মলার অমন হাসি নূপুরকে এক শরীর অস্বস্তি দেয়।

— 'বুবু ওই ত্রিবান্দ্রামের লোকটার কথা আমাকে খুব বেশি বলতো না। হঠাৎ করে শুনি সম্পর্কটা নেই'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা বললো, 'বিস্কুট খাবে ? একেবারে খালি পেটে চা খাচ্ছো, একেবারে দিদির মতো। তুমিও দুধ চিনি কিছু নাও না চায়ে। যমুনা ঠিক এরকম। আমার চায়ের সঙ্গে বিস্কুট না হলে চলে না। যমুনাদিকে কখনো দেখিনি বিস্কুট খেতে'।

— ত্রিবান্দ্রামের ওই সোজোর কথা বলতো তোমাকে কিছু ?

নূপুরের মনে পড়ে সেই দিনগুলো। প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। সোজো ছুটে এলো যমুনার বোন এসেছে শুনে ! কত কোথাও যে ঘুরে বেরিয়েছে তিনজন। যমুনা আর সোজোর মধ্যে সম্পর্কটা নূপুর যতটুকু বুঝেছিল, বন্ধুত্বের। দু'জনে ফিজিক্সের পিএইচডি। বড় কোম্পানীতে ছিল, সোলার এনার্জি নিয়ে গবেষণা করছিল দুজন।

— 'বিয়েটা কেন করেছিল, আদৌ করেছিল কি না, কে জানে ! নাকি প্রেম করতো, প্রেমের বিয়ে ?'

নির্মলা চায়ের খালি কাপ দুটো তুলে নিয়ে রান্নাঘরে রেখে এসে বলে— 'করেছিল বলেই তো জানতাম। পুরোনো জিনিস ঘাঁটার দরকারটা কী ! এ দেশের কোথায় ছিল না ছিল কী করেছে না করেছে এ নিয়ে আমাকে ডিটেইলস কিছু বলেনি। সোজার কথা অত হত না। বলতো, খুব স্ট্রাগল করেছি। কাউকে যদি বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তবে তো তা স্ট্রাগলের মধ্যেই পড়ে'।

নূপুর বলে—'দুজনে কিন্তু চমৎকার বন্ধু ছিল। ওরকমই তো দেখেছি। এক সপ্তাহ ছিলাম। সোজো কিন্তু বুবুর সঙ্গে সারাদিন কাটাতো কিন্তু রাতে থাকতোনা। প্রেম ট্রেম করলে নিশ্চয়ই থাকতো'।

অনেকক্ষণ দুজনই চুপচাপ। নির্মলা বলে— 'চান টান করো, কিছু ব্রেকফাস্ট করবে তো'।

এক টান টান যুবতী টানা টানা চোখ বাড়িতে ঢুকে বাসন মাজা আর ঘরদোর পরিস্কার করার কাজ করতে শুরু করে। উঁকি মেরে বারবার দেখে নূপুরকে। নির্মলাকে জিজ্ঞেস করে, যমুনাদির বোন বুঝি ?

নির্মলা মাথা নেড়ে রান্নাঘরে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো লুচি আর বেগুন ভাজা নিয়ে।

— বিছানায় ?

— আমরা তো ব্রেকফাস্ট খাটে বসেই করতাম।

— ও। কী খেতো বুবু ?

— কোনোদিন লুচি আলুর দম, কোনোদিন পরিজ, কোনোদিন রুটি বেগুনভাজা, কোনোদিন কর্ন ফ্লেক্স, কোনোদিন কিছুই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কোনোদিন কিছুই না ?

— কিছুই-না-টাই আসলে বেশি চলতো।

— তুমি বানাতে ব্রেকফাস্ট।

— কোনওদিন আমি। কোনওদিন যমুনা। তবে আমিই বেশির ভাগ করতাম। আমার রান্নার বেশ প্রশংসা করতো।

— তারপর ?

— তারপর তো হুড়মুড় করে উঠে যমুনা চলে যেত ওর অফিসে। আর আমি রান্নাবান্না সেরে, ভাত খেয়ে তারপর অফিসের দিকে রওনা হই। যমুনা নিজেই গাড়ি নিয়ে চলে যেত। আমি ট্যাক্সিতে, কখনও অটোতে, বাসে।

— কেন ড্রাইভার তো তোমাকেও অফিসে পৌঁছে দিতে পারতো ?

নির্মলা হেসে বলে, ড্রাইভার ছিল না। অবশ্য অনেক আগে ছিল একটা। একটা পাঁড় মদ্যপ। আমার ভয় হত। আমিই যমুনাকে বলে বলে ড্রাইভার ছাড়িয়েছি। যমুনা তাই নিজেই চালাতো। আর আমার অফিস তো খুব বেশি দূরে নয়। মাত্র পনেরো মিনিটের পথ।

— তুমি গাড়ি চালাও না ?

— না গো। শেখা হয়নি। সন্ধ্যেবেলা বাইরে বেরোলে যমুনাই চালায়। চালাতো।

— খুব যেতে বাইরে ?

— অনেকটা আমার কারণেই যেতে হত। কোথাও ভালো গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে, আমি যাবোই। ভালো নাটক হচ্ছে, যাবো। অবশ্য যমুনা ঘরে বসে বই টই পড়তেই পছন্দ করতো বেশি।

নূপুর হাসে। আবার ভেতরে কষ্টও হয়। নিজের বোন কী ছিল কেমন ছিল তা শুনতে হচ্ছে অচেনা এক মানুষের কাছে।

লুচি আর বেগুনভাজা বেশ সুস্বাদু। খেতে খেতে নূপুর জিজ্ঞেস করে, 'বাংলাদেশে কেন যেত না তোমার যমুনাদি, কিছু বলতো ?'

— 'তেমন কিছু বলতো না। বলতো, ও দেশে তার কেউ নেই। তুমি আছো, কিন্তু তুমি তো আর দেশে ছিলে না।

— আর কিছু বলতো না, যেমন ধরো তপুর বাবার কথা।

— তপুর বাবার সঙ্গে যে বিয়ে হয়নি বলেছে।

— আর কিছু বলেনি ?

— আর কী বলবে ?

— তপু ওর বাবার কথা জানতে চায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা ভুরু কুঁচকে বলে, বাবা ? হঠাৎ বাবা এল কোত্থেকে ?

— কেন, আসতে পারে না বুঝি ? নূপুর বলে।

— তপু ছোট বেলায় জানতে চেয়েছে কী না সে জানি না। আমি যদ্দিন থেকে আছি, শুনিনি। যমুনা একবার বলেছিল, ছোট বেলা থেকে বাবা বাবা বলে বাচ্চাদের মাথা খারাপ করে না দিলে ওদের কোনও কৌতূহল জন্মায় না বাবা জিনিসটাকে দেখার জন্য।

— যমুনাদি কিছু বলতো না তোমাকে ? ধরো, তপুর বাবা যে বেঁচে নেই, সে কথা ?

— বেঁচে নেই বুঝি ?

নির্মলা উঠে চলে গেল হঠাৎ। কাজ করছে মেয়েটির সঙ্গে কী কী সব রান্না বান্না কাটা বাটা নিয়ে কথা বলে ফিরে এলো। মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, তপু কোনোদিন ওর বাবার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। বাবা কে ছিল, কেমন ছিল, বাবাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এমন আবদার কখনো করতে শুনিনি।

— হ্যাঁ, সে তো বলেছোই। মাথা আসলে বাড়িতে খারাপ না করলেও ইস্কুল টিস্কুলের বন্ধুরাই তো খারাপ করতে পারে। প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করতে পারে, আমাদের তো বাবা আছে, তোমার বাবা নেই কেন !

নির্মলা কোনও উত্তর দেয়না।

নূপুর ভাবতে থাকে, তপু কী করে মনে রাখবে তার বাবাকে। তপুর তখন দেড় বছর বয়স যখন সে তার বাবাকে শেষ দেখেছে। মনে থাকলেও কোনও টান থাকার কথা নয়। ইস্কুলে আর বাড়িতে এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলে হয়তো বাবা বলে কিছুর অস্তিত্বও আর শেষ অবধি থাকে না।

যমুনা আর পাশার আশ্চর্য প্রেমের দিনগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখতো নূপুর। কিন্তু প্রেম সত্যিই মরিচিকার মতো। এই আছে মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু নেই। নূপুরকে বাচ্চাকে দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যমুনা। বাবা মা নূপুরকে যেতে দিতে চায়নি। অবিবাহিত মেয়ে গর্ভবতী হয়েছে, আবার নির্লজ্জের মতো প্রসবও করেছে, আবার আত্মীয় স্বজনকে ডাকাডাকিও করছে বাচ্চা দেখতে ! নূপুর যেদিন ঢাকায় বোনের কাছে যাবে বলে আবদার করেছিল, 'এ কেমন মেয়ে গর্ভে ধরেছিলাম'— মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল । বাড়িসুদ্ধ লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে যমুনার মেয়েকে দেখতে গিয়েছিল নূপুর। যদিও বাবা মা রাগ দেখাতো, হেন অপমানজনক কথা নেই যে না বলতো, কিন্তু তারপরও নূপুর ভালো করেই জানতো ওরা দুজনই চায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমুনার প্রয়োজনে নূপুর যমুনার কাছে যাক। যমুনা সমাজের নিয়ম-না-মানা-মেয়ে, মেধাবী-বুদ্ধিমতী-মেয়ে, এ মেয়ে নিয়ে সমাজে মুখ দেখানো যেত না, কিন্তু এ মেয়ে নিয়ে ভেতরে ভেতরে গর্ব করা যেত। গর্ব করতো ওরা, অবশ্য কিছুই বুঝতে দিত না যমুনাকে। বাবা মা'র ঠিক করা পাত্রকে বিয়ে করেছিল, অত্যাচার থেকে বাঁচতে সেই পাত্রকে শীঘ্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল যমুনা। যমুনার বাবা মা'ও জানে যে এ ছাড়া যমুনার আর করার কিছু ছিল না। যমুনা ঠিক কাজটিই করেছিল। একটা অত্যাচারী পাষণ্ডকে ত্যাগ না করে উপায় ছিল না। এরপর বাবা মা যা চেয়েছিল, তা হল দেখেশুনে একটা ভালো পাত্র দেখে বিয়ের পিঁড়িতে বসা। কিন্তু কোনও পিঁড়িতে বসতে যমুনা আর রাজি ছিল না। বলতো 'আমি যে গদির চেয়ারটায় বসে আছি, সে চেয়ারটাতেই বসে থাকবো, চেয়ার ছেড়ে গিয়ে নিচু পিঁড়িতে আমাকে আর বসতে বলো না। অত নিচে নামতে আমি আর পারবো না'। নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে ভাঙা, তারপর যার সঙ্গে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে থাকা, শেষ অবদি চূড়ান্ত অন্যায় করলো, এরই হয়তো বাকি ছিল, সন্তান জন্ম দিল অবিবাহিত মেয়ে। পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করো, কিন্তু শরীর নিয়ে চলবে না, এই হল যমুনার আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য। যমুনার বক্তব্য ছিল, 'এ আমার শরীর, আমি আমার শরীর নিয়ে কী করবো না করবো সে আমি বুঝবো। এ শরীরের ওপর অধিকার আমার, অন্য কারওর নয়'। পাশা ছিল তপুর বন্ধু, কিন্তু পাশা যমুনার স্বামী ছিল না। এই সত্য নূপুরকে গুটিয়ে রাখতো ভয়ে, বিভ্রান্তিতে। যমুনা তাকে কত কিছু যে বলতো, বলতো, 'মেয়েরা কারও সম্পত্তি নয়, পুরুষের সম্পত্তি নয়, সমাজের সম্পত্তি নয়। আমি কার সঙ্গে শোবো তার সিদ্ধান্ত আমার পরিবার নেবে, আমার প্রতিবেশি নেবে, সমাজের একশ একটা বদমাশ লোক নেবে, নাকি আমি নেব ? আমি নেব। আমি প্রেগনেন্ট হব কি না, হলে কার দ্বারা হব, কটা বাচ্চা হবে আমার, ছেলে নেব না মেয়ে নেব, সে সিদ্ধান্ত আমি নেব, অন্য কেউ নয়'। নূপুর মন দিয়ে শুনতো যমুনার কথা। কিছু বুঝতো, কিছু আবার বুঝতো না। কত আর তখন বয়স ছিল নূপুরের !

'আমার একার ওভামে হবে না, ঠিক আছে স্পার্ম নিয়েছি। কিন্তু যে লোকের স্পার্ম নিলাম, তার অধিকার কী কারণে আমার বাচ্চার ওপর আমার চেয়েও বেশি হবে ? আমি ন'মাস কষ্ট করে পেটে রেখে যে বাচ্চাটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হওয়ালাম, সে বাচ্চা কেন হঠাৎ করে তার বাচ্চা বনে যাবে ? আমার বাচ্চা আমার নামের টাইটেল পাবে, অন্য কারও নয়'।

যমুনা আবার নূপুরকে বুঝিয়ে বলে, 'ভাবিস না যেন যে পাশা বাচ্চার ওপর অধিকার দাবি করছে। সেটা করছে না। আমি চাইছি, এ বাচ্চা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চা বলে পরিচিত হোক। কারও অত নাক গলানোর দরকার নেই বাচ্চার বাবা কে এ নিয়ে। বাচ্চার বাবাকে যদি বিয়ে করতাম, যদি মনে করতাম বাচ্চার বাবা মা দুজনে বাচ্চাকে বড় করবো, মানুষ করবো, তাহলে কথা ছিল। পাশাকে অনেক আগেই বলে রেখেছি, যে, আমি একটা বাচ্চা নেব, সেই বাচ্চার ওপর পাশার কোনওরকম দাবি বা কিছু থাকবে না।

বোঝাতে পারলাম তোকে ?' যমুনা জিজ্ঞেস করতো। নূপুর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতো।

নামটা নূপুরই রেখেছিল, তপু। কী কারণে তপু নামটা নূপুরের পছন্দ হয়েছিল, এখন আর মনে নেই। তপন বা তপু নামের কোনও একটা ছেলেকে কি তার ভালো লাগতো ? হয়তো লাগতো। নূপুরকে শুধু ডাক নাম নয়, ভালো নামও রাখতে বলেছিল যমুনা। তপুর ভালো নাম তপস্যা চৌধুরী। যমুনা নূপুরের দেওয়া নামই পছন্দ করেছিল।

যমুনার শান্তিবাগের ফ্ল্যাটটা তখন নূপুরের বাড়িঘর হয়ে উঠেছিল। ময়মনসিংহ থেকে প্রায়ই চলে আসতো। দু'তিন মাস পর এমন হয়েছিল যমুনার কাছেই থেকে গিয়েছিল নূপুর। খুব প্রয়োজন না হলে ময়মনসিংহে যেত না। তপুকে নূপুরের কাছে রেখেই যমুনা আপিসে যেত। তপুকে খাওয়ানো, স্নান করানো, গল্প শোনানো, ঘুম পাড়ানো, যা কিছু করার, নূপুরই করতো। নূপুর ছিল বিরাট এক ভরসা যমুনার জন্য। কী নিশ্চিন্তে তপুকে লালন পালনের দায়িত্ব নূপুরকে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতো যমুনা ! অনেকটা মা'র কাছে বাচ্চা রাখার মতো।

তপু জন্মাবার পর আগের মতো না হলেও পাশা আসতো যমুনার ফ্ল্যাটে। নূপুর লক্ষ্য করেছে পাশার সঙ্গে তখন প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে যমুনার। যমুনা পাশাকে বলতো তপুকে যেন কোলে না নেয়। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও তপুকে জোর করে কোলে নিত। নূপুর বলতো, 'এমন করো কেন বুবু, পাশা ভাই তো তপুর বাবা। বাবাকে তো এভাবে বঞ্চিত করা উচিত নয়'।

'যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস না'। যমুনা জোরে ধমক দিত নূপুরকে।

কী জানি না ? জিজ্ঞেস করলে যমুনা বলেছে, 'ও যেন কেমন করে কোলে নেয় তপুকে, দেখলে মনে হয় ওর হাত থেকে পড়ে যাবে তপু। বাচ্চা যে জীবনে কোনোদিন কোলে নেয়নি, তা তো নয়। নিয়েছে। তবে তপুর বেলায় এত হেলাফেলা কেন !'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর লক্ষ করেছে যে যমুনা পাশার জন্য পাগল ছিল, সেই যমুনাই ধীরে ধীরে চাইছে না যমুনার ফ্ল্যাটে অত ঘন ঘন পাশা আসুক, বা রাত কাটাক। সন্ধ্যেটা কাটাতো প্রায়ই। কিন্তু একসময় মনে হতো যমুনা ওই সন্ধ্যেটাও চায়নি। চেয়েছে আপিস থেকে ফিরে পাশাকে নিয়ে নয়, নূপুর আর তপুকে নিয়ে সময় কাটাতে।

নূপুর জানতো না যে পাশা শুধু প্রেম করতে চেয়েছিল যমুনার সঙ্গে, কিন্তু বাচ্চা জাতীয় কোনও জিনিস সে চায়নি। যমুনার বাচ্চা পেটে আসার পর থেকেই পাশা চেঁচামেচি করছিল। নূপুর জানতো না যে পাশা বলতো, 'পেটের জিনিসটা দূর করো যমুনা। পরে প্রব্লেম হবে'। নূপুর জানতো না যে যমুনা পাশাকে বলতো, — 'অশিক্ষিতের মতো কথা বলো না। পেটের জিনিস মানেটা কি ? দূর করো মানে ? বলো, অ্যাবরসন করো'। পাশা বলতো, আদর করে বলতো, ধমক দিয়ে বলতো, — 'অ্যাবরসন করো'।

— 'না, আমি অ্যাবরসন করবো না। কেন করবো অ্যাবরসন ?'

— 'বিয়ে হয়নি। জারজ সন্তান। এসব। সমাজটাকে তো চেন'।

— 'চিনি। খুব ভালো চিনি। তুমি ছেলে হয়ে কত আর চেন ! সমাজটাকে বেশি চেনা যায় মেয়ে হলে। তুমি তো আর মেয়ে নও। সমাজটা কী, তা আমাকে বলো না। তোমার চেয়ে বেশ ভালো জানি। আর জেনেই আমি এই বাচ্চাটা উইদাউট ওয়েডলক নিচ্ছি, সো কল্ড জারজ বাচ্চা, জেনেশুনেই নিচ্ছি'।

— 'দুনিয়াসুদ্ধ তো বলে বেড়াবে এ বাচ্চার বাবা আমি'।

— 'সে নিয়ে ভয় পাওয়ার তোমার দরকার নেই। আমি কোথাও বলবো না তোমার কথা। এ আমার বাচ্চা। এটা যে মানবে, সে মানবে। যে মানবে না, তাকে জোর করে মানাতে যাবো না আমি। হ্যাঁ এ বাচ্চা তৈরিতে তোমার অবদান আছে। কিন্তু যেহেতু তুমি ম্যারেড, তুমি চাও না এক্সপোজড হতে। তুমি দুনিয়াকে দেখাতে চাও তুমি একটা ফেইথফুল হাজবেন্ড। বাট ইউ আর এ প্রমিসক্যুয়াস ম্যান। ইউ চিট অন ইওর ওয়াইফ। তুমি মেয়েদের এক্সপ্লয়েট করো। আমার একটা বাচ্চার শখ ছিল, আমি নিচ্ছি। তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা থাকার কারণে এটি হতে পেরেছে। তোমার বাচ্চার শখ নেই। তোমার অলরেডি দুটো বাচ্চা আছে। সুতরাং তুমি চেয়েছো একে অ্যাবরসন করাতে। আমি করবো না অ্যাবরসন। এ বাচ্চার ওপর তোমার অধিকার নেই। আমি একে বড় করবো, মানুষ করবো। আমাকে বিরক্ত করো না। আমি তোমার মিসট্রেস নই। এ বাচ্চা তোমার নয়। এ বাচ্চা আমার। লীভ মি এলোন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশা ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিতে দিতে বলেছে, 'তুমি আসলে একটা মান্ধাতার আমলে বাস করছো। মেয়েদের রাইটসএর কথা বলো, অ্যাবরসন রাইটস যে মেয়েরা বিদেশে কত আন্দোলন করে পেয়েছে, তা জানো ? বেশ একেবারে নারীবাদীর ভাব দেখাও। নারীবাদের কিছুই জানো না'।

যমুনা বলেছে,— 'দেখ, আমি কিন্তু অ্যাবরসনের বিপক্ষের মানুষ নই। মেয়েদের যখন ইচ্ছে তখন অ্যাবরসন করার অধিকারের ভীষণ পক্ষে। আবার যখন ইচ্ছে তখন অ্যবরসন না করার অধিকারের পক্ষেও'।

যমুনা জেদ করেছে অথবা ইচ্ছে করেছে অথবা শখ করেছে, বাচ্চা সে নিয়েছে। পাশার বাধা যমুনার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে কোনও সাহায্য তো করেইনি, বরং সিদ্ধান্তে যমুনাকে আরও অটল করেছে। এই শিশু না জন্মালে কারও কোনও ক্ষতি হত না, মানব প্রজাতির টিকে থাকায় কোনও ব্যাঘাত ঘটতো না। পৃথিবীতে অগুনতি শিশু আছে। লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতিবছর শুধু খেতে না পেয়েই মরে যাচ্ছে। যমুনা কোনও একটা শিশুর দায়িত্ব নিতে পারতো। কিন্তু তারপরও অবিবাহিত অবস্থায় বাচ্চা সে নিয়েছে। আত্মীয়দের প্রায় সবার সঙ্গে সম্পর্কের ইতি ঘটিয়ে হলেও নিয়েছে। এ কি কেবলই জেদের কারণে নাকি 'মেয়েদের শরীর নিয়ে মেয়েরা কী করবে, তার সিদ্ধান্ত মেয়েরাই নেবে'— এই মতকে নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার কারণেই যা করার সে করেছে !

নূপুর প্রায় দেড় বছর ছিল যমুনার বাড়িতে। একাই তখন ছিল সে যমুনার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন। নূপুর ছাড়া তপুকে যমুনার পরিবারের আর কেউ দেখেনি। কারও দেখতে ইচ্ছেও হয়নি। নাইম ঢাকা শহরেই ছিল। নাইমের বাড়িতে প্রয়োজনে যেত সে। নাইম জানতো যমুনার বাচ্চা হয়েছে, নূপুরই বলেছিল। শুধু ছি ছিই করেছে। নাইমের বউও ছি ছি করেছে। দু'জনের এই ছি ছি শুনতে শুনতে নূপুর ওদের চৌহদ্দি থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালায়। যমুনার বাড়িতে ফিরে সে প্রাণ ফিরে পায়। এ বাড়িতে তার অধিকার তার বাবার বাড়িতে তার যত অধিকার তার চেয়েও বেশি। এ বাড়িতে সে তার বন্ধু বা বান্ধবীকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে, আপ্যায়ণ করতে পারে। এ বাড়ি থেকে যখন খুশি যেখানে খুশি যেতে পারে, কাউকে কোনও কৈফিয়ত দিতে হয় না। বাবার বাড়িতে এসবের অনেক কিছু সম্ভব নয়।

নূপুর টের পেত দিন দিন পাশার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে যমুনার। যমুনা উতলা হচ্ছে না পাশা এলে। বরং যখন সন্ধ্যেটা কাটাচ্ছে দুজন, ঘরে বা বারান্দায়, গলার স্বর দুজনেরই চড়া হচ্ছে। চিৎকার বাড়ছে দিনদিন। একদিন নূপুর শুনতে পেলো যমুনা বলছে, —'জন্মের আগেও ছিল রাগ, জন্ম নেওয়ার পরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার রাগ মেয়েটার ওপর, এ জন্মালো কেন। দেখতে তোমার মতো হল কেন। তপুকে তুমি পারলে মেরে ফেলবে। তোমার কাছে তপুর জীবনের চেয়েও, আমার জীবনের চেয়েও বড় তোমার সংসার, তোমার চাকরি, তোমার সমাজ, তোমার বিচ্ছিরি হিপোক্রেট দুনিয়া। লীভ মি এলোন পাশা। আই ডোন্ট লাভ ইউ এনিমোর'।

পাশা মেজাজ খারাপ করে চলে যেতো। কিন্তু দুদিন পর আবার আসতো।

যমুনার শোবার ঘরের দেয়ালে বড় একটা বাঁধানো ছবি, নূপুরের কোলে তপু। সেই তপু যাকে জন্মের পর আদর দিয়ে আহলাদ দিয়ে বড় করছিল নূপুর। তপুর বয়স তখন এক। ঘটা করে জন্মদিনের উৎসব হয়েছিল। জন্মদিনে যমুনা বিশ্বাস করে না। উৎসব নূপুরের ইচ্ছেয় হয়েছিল। নূপুর আর যমুনার কাছের ক'জন বন্ধু এসেছিল। আত্মীয়দের কেউ ছিল না। বেশির ভাগ বন্ধুই জানতো, পাশা তপুর বাবা, এবং পাশার সঙ্গে হয় গোপনে যমুনার বিয়ে হয়ে গেছে, অথবা না হয়ে থাকলে যে কোনও একদিন হয়ে যাবে। শহরের আনাচে কানাচে বিবাহিত পুরুষগুলোর গোপনে কিছু স্ত্রী থাকাটা যে অস্বাভাবিক কিছু নয়, তা ভদ্রলোক অভদ্রলোক সবাই জানে। জন্মদিনের উৎসবে নূপুরের সঙ্গে তপুর প্রচুর ছবি তুলেছিল যমুনা। ছবিগুলো নূপুরের কাছেই থাকার কথা। কোথায় সেই অ্যালবাম ! কে জানে কোথায় ! যমুনা তো সব ফেলে দেশ ছেড়েছিল। নূপুর অনেক কিছু সঙ্গে নিয়েছিল, কিন্তু ছবির অ্যালবাম নেয়নি। ছবির অ্যালবাম তাহলে যমুনাই নিয়েছিল। আগে কখনও যমুনার বাড়িতে নূপুর দেখেনি এই ছবি। যমুনা যদি এই ছবিটিকে না রাখতো বাঁধিয়ে, তাহলে হয়তো মনেও পড়তো না সেই জন্মদিনের উৎসবের কথা। সেদিন জন্মদিনে, নূপুরের মনে আছে, সারাদিন পর রাত বারোটা পার করে পাশা এসেছিল, খালি হাতে। খালি হাতে বলে যমুনা অসন্তুষ্ট হয়নি, হয়েছিল নূপুর। 'পাশা ভাই, সারাদিন আপনার এখানে আসার সময় হল না। বার্থডে পার্টি তো শেষ। আপনার জন্য আমরা সবাই ওয়েট করলাম। তপুকে উইশ করবেন না ?'

পাশা গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'যমুনা কোথায় ? নেই নাকি ?'

— 'থাকবে না কেন ? ঘুমিয়েছে বোধ হয়। খালি হাতে এসেছেন ? তপুর জন্য কোনও গিফট নেই ?'

পাশা যমুনার শোবার ঘরে ঢুকে চিৎকার করে কথা বলতে থাকে। কী বলতে থাকে কে জানে। তপুর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে নূপুর তপুকে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবিটির দিকে তন্ময় তাকিয়ে থাকতে থাকতে নূপুর ভাবে, এই তপুকেই সে হাঁটতে শিখিয়েছিল, কথা বলতে শিখিয়েছিল। তপু তখন তার মা'র চেয়েও বেশি চিনতো নূপুরকে। নূপুরকেই আঁকড়ে থাকতো। নূপুরের সঙ্গেই ঘুমোতো। যমুনা বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে ঘুমোতে পারতো না। মাঝে মাঝে নূপুরের মনে হত, বুঝি যমুনার নয়, তপু তারই মেয়ে, তারই গর্ভজাত সন্তান। চোখ ভিজে ওঠে নূপুরের। টুপ টুপ করে সুখের সেই সব স্মৃতি আর চোখের জল ঝরতে থাকে।

যখন এঘরে প্রথম ঢুকেছিল নূপুর, আরও একটি ছবির দিকে চোখ গেছে। নূপুর আর যমুনা দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আছে। দু'জন হেসে গড়িয়ে পড়ছে. সেই সব কৈশোরের আর যৌবনের ছবিও এঘরে বা ওঘরে বাঁধানো, দেয়ালে ঝুলছে নয়তো টেবিলে দাঁড় করানো।

নির্মলা পেছনে এসে দাঁড়ায়, ভারী গলায় বলে, 'শোনো নূপুর, গণদর্পণের লোক এসেছে। যমুনা'দির ডেডবডিটা ওরা নেবে। তোমার সঙ্গে কথা বলবে ওরা, যাও ওরা নিচে বসে আছে'।

-'হুঁ। যাচ্ছি'।

যাচ্ছি বলেও আর যায় না নূপুর। স্মৃতির দোলনায় ভয়ানক দুলতে থাকে। ভুলে যায় নিচে কেউ বসে আছে, তাকে যেতে হবে কথা বলতে। কথা সব নির্মলাই বলতে পারতো। কোনও হয়তো দরকারই ছিল না নূপুরের কোনও সিদ্ধান্তের। কিন্তু তপু তাকে এই দায়িত্বটি দিয়েছে। ঠিক যেমন যমুনা দায়িত্ব দিয়েছিল নূপুরকে, তপুর জন্য যা কিছু করার করতে। আজ তপু তাকে দায়িত্ব দিল যমুনার জন্য যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিতে। ছাব্বিশ বছর পর আবার সেই দায়িত্ব কাঁধে। নূপুরের ভালো লাগে দায়িত্ব নিতে। তাকে কখনই কারও দায়িত্ব নিতে হয়নি। চেয়েছিল নিতে, কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি কোনো দায়িত্ব। নিজের ছেলের দায়িত্ব অন্যরাই নিয়েছে, তারই নেওয়া হয়নি। নূপুর বোঝে না, নূপুর বুদ্ধিহীন, নূপুর নষ্ট করে ফেলবে, এসবই শুনে এসেছিল জয় জন্মাবার পর।

জয় আর তপুকে যখন জীবনে একবার কী দু'বার এক সঙ্গে পেয়েছিল, নূপুর লক্ষ্য করেছে, জয়ের জন্য নয়, তপুর জন্যই তাকে উতলা হতে। জয় চিরকালই ছিল তার বাবার ছেলে। নূপুরকে মা বলে ডাকতো। ওর বেশি কিছু জয় থেকে সে আশাও হয়তো কোনোদিন করেনি।

নির্মলা আবার ডাকে নূপুরকে। 'নূপুর, ব্রজ অপেক্ষা করছে। ওদের সঙ্গে জরুরি কথাগুলো সেরে এসো। চানও করলে না। যে শাড়ি পরে দেশ থেকে এসেছো, সে শাড়ি পরেই রয়েছো এখনো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর এবার নিজেকে যমুনার শোবার ঘর থেকে উঠিয়ে নিচের তলায় নামিয়ে ব্রজ'র সামনে বসায়। বসায় বটে কিন্তু মন তখনও যমুনার শান্তিবাগের বাড়িতে। যমুনা আর নূপুর বিছানায় মুখোমুখি শুয়ে আছে, দুজনের মাঝখানে বসে তপু খেলছে। যমুনা বলছে, তোর আর ময়মনসিংহে থাকতে হবে না। এখানে আমার সঙ্গেই থাক। দু'বোনে থাকবো বাকি জীবন। তুই এই শহরে একটা ভালো চাকরি করবি। এই ফ্ল্যাট ছোট মনে হলে একটা বড় ফ্ল্যাট নেবো। আর যদি বিয়ে টিয়ে করিস, তাহলে এক কাজ করবো, একটা বাড়িই কিনে ফেলবো, নিচতলায় আমি, দোতলায় তুই, তোর সংসার। খাবো এক সঙ্গে। এক টেবিলে বসে, গল্প করতে করতে, গান শুনতে শুনতে, নাটক দেখতে দেখতে। ঘুরে বেড়াবো এক সঙ্গে। এই ছোট গাড়িটা বিক্রি করে বড় একটা গাড়ি কিনবো। ছুটি ছাটায় প্রায়ই চলে যাবো দূরে কোথাও। আর তুই যদি ভালো কোনও ছেলেকে বিয়ে করিস, ওকে দিব্যি ছোট ভাই বানিয়ে নেব। আমাদের ভাই বোনের সুখের সংসার। তুই সংসারটা ভালো বুঝিস। তোর হাতেই সংসার খরচের টাকা পয়সা দিয়ে দেব। তোর পয়সা তুই জমাবি ব্যাংকে। তোর কোনও টাকা খরচ করার দরকার নেই। যদি এমন হয়, আমার খুব প্রয়োজন পড়ছে টাকা পয়সার, মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার জন্য একটা প্রাইভেট স্পেসশিপ কিনবো, তখন তোর কাছে ধার নেব, কেমন ? আমরা সারা দেশটা ঘুরবো, পাশের দেশগুলো দেখবো, পাহাড় সমুদ্র দেখবো, দূরের দেশগুলোতেও সাহস করে চলে যাবো। জীবন তো একটাই রে, নূপুর'।

নূপুরের কী যে ভালো লাগতো যমুনাকে শুনতে। মেঘেয় ভেসে বেড়ানোর মতো।

ব্রজ বলল, 'কী এত ভাবছেন, বলুন। আপনি যমুনা চৌধুরীর বোন। আপনার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি ছিলেন না কিন্তু আমরা অরগানগুলো নিয়ে নিয়েছি। নির্মলাদি বললেন, আপনি আসার পর বাকিটা হবে। এখন বডিটা আজই নিয়ে যাবো ভাবছি'।

নূপুরের মলিন কণ্ঠস্বর। বললো— মেডিকেলে তো ?

— হ্যাঁ।

— যমুনাদি কবে মরণোত্তর দেহ দিয়ে গেছে ?

অন্যমনস্ক নূপুর অবান্তর প্রশ্ন করে। ব্রজ বোঝে। নির্মলাও।

— বছর পাঁচেক আগে। বডিটা দরকার। আমাদের গণদর্পণে যারা বডি দিয়ে যান, আমরা কখনও তাদের বডি এতদিন ফেলে রাখি না।

ব্রজ পাঁচ বছর আগের চুক্তিপত্রটি এগিয়ে দেয় নূপুরের দিকে। যমুনার সই। সইটাতে আঙুল বুলোয় নূপুর। বুলোতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রজ বলে—'আপনার জন্য নিশ্চয়ই শকিং। দিদিরা তো অনেকটা মায়ের মতো'।

— 'আসলে আমি তো আমার দিদিটাকে একটু ভালো করে দেখিনি। একটু দেখবো, একটু স্পর্শ করবো..। এই তো শেষ দেখা, মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর আর তো কোনোদিন স্পর্শ করতে পারবো না'।

কণ্ঠস্বরটা ভেঙে আসে। তারপরও স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে নূপুর।

ব্রজ আর তার সঙ্গের ছেলে মাথা নোয়ায়। টানটান মেয়েটা একটা ট্রেতে চার বাটি মিস্টি আর চার গ্লাস জল দিয়ে যায়। সবাই অপেক্ষা করছিল নূপুর একটু সামলে উঠে বলবে, 'ঠিক আছে আজ শেষ দেখা দেখে নিই, আজ বিকেলেই নিয়ে যান'।

পার্ক স্ট্রিটের পিস হেভেনে রাখা হয়েছে যমুনার দেহ। ব্রজ বললো, 'রাখার খরচও তো অনেক, আর তাছাড়া...'

নূপুর থামিয়ে দেয় ব্রজকে, 'জানি খরচ অনেক। আমাকে প্লিজ খরচের কথা বলবেন না। খরচ বাঁচানোর জন্য আমার দিদিকে আমি দূর করে দেব, তা হতে পারে না'।

নির্মলা মূর্তির মতো বসে থাকে পাশে। গম্ভীর মুখ। নূপুর অপ্রস্তুত বোধ করে। চিকন স্বরে বলে, 'আসলে আমি তপুর সঙ্গে আবার কথা বলতে চাই। ও যদি আসতে চায়। দেখি আজ আবার বলবো। ওর তো মা। কাছে থাকুক এই সময়টায়। ও যদিও আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছে, তারপরও...। আমি চাই তপু আসুক। তপু আসার পর মেডিকেলে নেওয়া হোক বডি।'

নির্মলা বলে, 'ওর নাকি হার্ভার্ডে এখন কী সব এক্সাম চলছে'।

— 'তাই নাকি ? আমাকে বলেনি। বলেছে, মায়ের মৃত মুখ সে দেখতে চায় না। মৃত মুখের স্মৃতি সে চায় না। যেমন মাকে দেখেছে, সদা হাসিখুশি, প্রাণময়, উচ্ছল। তেমন মাকেই রাখতে চায় স্মৃতিতে'।

ব্রজ আর নির্মলা দুজনই বললো যে তারা তপুর এই অনুভূতিটাকেই ভালো বুঝতে পারছে।

সামনে ব্রজ আর ব্রজ'র সঙ্গের লোক আর পাশে নির্মলা থাকা সত্ত্বেও নূপুর সেই অতীতে সাঁতরায়। ছোট্ট সেই তপু এখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইডডি করছে। বিখ্যাত পদার্থবিদ লোরেন্স ক্রস-এর সঙ্গে বই লিখছে এক সঙ্গে। পিএইচডি শেষ করে হার্ভার্ডেই শিক্ষকতার চাকরিতে ঢুকবে, এরকমই ঠিক হয়ে আছে। তপুর জন্য গর্ব হতে থাকে নূপুরের। তপুর জন্ম নিয়ে ছি ছি করা লোকগুলো আজ কোথায়, আর তপু কোথায় ! সংসারে আর কেউ এত পড়াশোনা করেনি। যমুনা করেছিল, এখন যমুনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে তপু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর কোনওদিন যায়নি হার্ভার্ডে। যতদিন ছিল আমেরিকায়, নিউইয়র্কের এল্মহার্স্ট অ্যাভেন্যুতে ছিল। যে ভাড়া বাড়িতে উঠেছিল, সেই বাড়িতেই টানা আঠারো না উনিশ বছর কাটিয়েছে। বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়িয়েছে, বাড়িতে আরশোলা আর ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছে, তারপরও ছাড়েনি। না ছাড়াটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অতগুলো বছর এল্মহার্স্ট অ্যাভেন্যু আর জ্যাকসন হাইটসেই বিচরণ করেছে। যমুনাকে ঈর্ষা করতো নূপুর। মুখে কোনোদিন না বললেও মনে মনে ঠিক জানে সে ঈর্ষা করতো যমুনাকে। যমুনার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পেছনে এই ঈর্ষাই হয়তো কাজ করেছিল। নাকি রাগ ! নাকি অভিমান। নূপুর ঠিক জানে না। নাকি সবকিছু মিলিয়ে কিছু একটা ! তপু আমেরিকায় পড়াশোনা করছে, জানার পরও সে তপুর সঙ্গে না গেছে দেখা করতে, না বলেছে তপুকে আসতে তার কাছে।

জাঁকজমক করে বিয়ে হওয়া নূপুরের সংসার ছিল অশান্তির সংসার। যে সন্তানকে জগত ভুলে বড় করেছে, সেই জয় কলেজেই ঢুকতে পারেনি। ড্রাগ অ্যাডিকশান পনেরো বছর বয়স থেকেই। নূপুর বুঝতে পারেনি। যমুনা যখন শেষবার আমেরিকায় গেছে নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে, লক্ষ্য করেছে জয় সারাদিন ঘুমোচ্ছে। রাতে ঢুলুঢুলু, জোরে হাসছে, কথা বলতে গেলে শব্দগুলো জড়িয়ে যায়, কথায় কোনও যুক্তি নেই। নূপুর জয়কে মুখে তুলে খাওয়াচ্ছে। বাবা খাও, আমার সোনাটা, জাদুটা, হিরেটা। জয় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে নূপুরকে। যমুনা জয়কে এরকম অবস্থায় কখনও দেখেনি। ছিল প্রাণময় হাসিখুশি ছেলে। তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

যমুনা জানতো না সেই জয় এর মধ্যে ভয়ংকর পাল্টে গেছে। দু'দিন লক্ষ্য করেছে, তৃতীয় দিন নূপুরকে জিজ্ঞেস করেছে, —জয় কি নেশা করে ?

নূপুর ভুরু কুঁচকে নাক কুঁচকে ঠোঁট কুঁচকে যমুনার দিকে তাকায়, তিক্ত কণ্ঠস্বর। —'কী বলছো ?'

'জিজ্ঞেস করছি, জয় কি কোনও নেশা টেশা করে' ?

— নেশা ?

— হ্যাঁ নেশা।

— নেশা মানেটা কি ?

যমুনা রাগী স্বরে বলে, —'অত না বোঝার ভান করিস না। নেশা মানে নেশা। গাঁজা ভাঙ চরশ এসবের নাম শুনিস নি ? জয় কি ড্রাগস নেয় ? মানে খায় কোনও ঘুমের ওষুধ টষুধ ? ইনজেকশন নেয় ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের গা জ্বলে রাগে। বলে, — না। আমার ছেলে ভালো ছেলে। তুমি জয় সম্পর্কে বাজে কথা কেন বলছো আমি বুঝতে পারছি না।

— জয়ের ভালোর জন্য বলছি। মনে হচ্ছে জয় নেশাগ্রস্থ।

— আশ্চর্য। এই বাচ্চা ছেলে নেশা করবে কেন ! আমি ভাবতাম জয়কে তুমি বোধ হয় ভালোবাসো। তুমি যে ওকে দুচোখে দেখতে পাওনা তা জানতাম না।

— আমার কথার অদ্ভুত অর্থ করিস না। জয়কে দেখে আমার ভালো লাগছে না। একেবারে ড্রাগ অ্যাডিক্টএর মতো লাগছে জয়কে।

নূপুর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। যমুনা নূপুরের পিঠে আদর করে দিতে থাকে। যমুনার হাত পিঠ থেকে সরিয়ে দেয় নূপুর। বলে — 'বুবু তুমি চিরকালই আমাকে হিংসে করেছো। জয়কেও তোমার সহ্য হচ্ছে না। তোমার স্বামী নেই, সংসার নেই, ছেলে নেই। তুমি আমার বিয়ে আর সংসার কোনওদিন চাওনি। ঢাকায় যেমন তোমার বাড়িতে চাকরের কাজ করতাম, চেয়েছিলে সারাজীবন তেমন চাকর হয়েই থাকি তোমার। আমি বুঝি কেন তুমি জয়কে সহ্য করতে পারছো না। বলছো জয় নেশা করে। ও মদ খাবে ? আমার ছেলে জয় মদ খাবে ? যাও ওর ঘরে গিয়ে দেখ, দেখ মদ খায় কিনা। সোনার টুকরো ছেলে সারাটা রাত পড়াশোনা করে। দিনে একটুখানি ঘুমোয়। আর এখন তো ইস্কুলে ছুটি চলছে। ওর এত পড়াশোনা করা তোমার সহ্য হচ্ছে না। ভাবছো ও না আবার তপুর চেয়ে ভালও স্টুডেন্ট হয়ে যায়। সব বুঝি আমি বুবু'।

— সব যখন বুঝিস, তখন এটাও নিশ্চয়ই বুঝিস যে নেশা করতে হলে সব সময় মদের দরকার হয় না। ড্রাগের নেশাও নেশা। মদ ছাড়াও নানারকম পদার্থ আছে নেশা করার। অত যখন আমার কুমতলব, তোকে হিংসে করি, তোর সুখের সংসার সহ্য করতে পারছি না, আমার ছেলে নেই বলে তোর ছেলেকে হিংসে করে বদনাম করছি, তখন এটাও নিশ্চয়ই বুঝিস ড্রাগের নেশা খুব ভয়ংকর নেশা। এই নেশা ছাড়াতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। ডাক্তারের কাছে যা, আমার অনুরোধ'।

— 'তুমি কি করে জানো ও ড্রাগের নেশা করছে। ড্রাগের নেশা তুমি করেছো ?'

— 'আমি করিনি। আমি শুনেছি। পড়েছি। দেখেছি। নিজের জীবনে না ঘটলেও নলেজ থাকে মানুষের'।

— 'ডাক্তারের কাছে যেতে হলে তুমি যাও। তোমার মাথায় গণ্ডগোল আছে বুবু। তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও'।

— 'সে না হয় দেখাবো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— 'তুমি আমেরিকায় আমাকে দেখার নাম করে তুমি আমার ছেলের বিরুদ্ধে নোংরা কথা বলতে এসেছো। এত নোংরা মন তোমার ! ছিছি'।

— 'আমাকে ছিছি করার ঢের সময় পাবি নূপুর। জয়কে এখনই যদি না নিয়ে যাস, যদি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিস, পরে আফসোস করতে হবে। তুই না যেতে পারিস। আমি আছি এখানে, আমি হেল্প করি। আমি নিয়ে যাই। রিহ্যাবে দিতে হলে আমি দিই। তোর কিছু করতে হবে না'।

নূপুর চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আর অশান্তি ডেকে এনো না এই সংসারে'।

দুজনের চিৎকার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যমুনার এক কথা, 'ছেলেকে ডাক্তার দেখা' নূপুরের কথা, 'তুমি আমার চিরজীবনের শত্রু। আমার ভালো তুমি কোনওদিন চাওনি। আমাকে তোমার বাড়িতে তোমার মেয়ের দেখাশোনার জন্য রেখেছিলে। আমি জাস্ট একটা বেবি সিটারের বা গভর্নেসের কাজ করতাম। আমাকে বোন বলে মানো নি। তোমার কাছে ওভাবে থাকলে আমার বিয়েটাও হয়তো হত না। চিরকাল আমাকে ইউজ করেছো। নিজের মেয়ের মতো তোমার মেয়েকে লালন পালন করেছিলাম। তার এই প্রতিদান তুমি দিলে ? আমার ছেলের বিরুদ্ধে লেগেছো তুমি !' নূপুর চেঁচিয়ে কাঁদে। হাত পা কাঁপে রাগে আর আবেগে।

চেঁচিয়ে নূপুর এও বলে, যমুনা যেন অন্য কোথাও চলে যায়। আজই। যে কোনও কোথাও। কোনো হোটেলে বা অন্য কারও বাড়িতে। সে চায় না তার সংসারে কোনও বাইরের লোক নাক গলাক।

যমুনা শুয়ে শুয়ে ভাবে আজ সে বাইরের লোক। কিন্তু তার ওপর ছুঁড়ে দেওয়া অপমান, অপবাদ কিছুই তার চোখে জল আনে না, জল আনে জয়ের করুণ অবস্থা। আধচেতন মন। বিক্ষিপ্ত ভাবনা। যমুনার স্পষ্ট ধারণা জয় ভালো নেই, জয়ের চিকিৎসা দরকার।

ফোনে সে কথা বলে নিউইয়র্কের ডাক্তারদের সঙ্গে। ড্রাগের নেশা ছাড়ানোর বিশেষজ্ঞদের কাছে। অন্তত তিনজন বিশেষজ্ঞ যমুনাকে উপদেশ দেয়, রোগী নিয়ে চেম্বারে যেতে।

যমুনা নূপুরকে বলে,— 'আমি ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। জয়কে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবো। তোর যাওয়ার দরকার নেই। আমিই ওকে নিয়ে যাবো'।

নূপুর জোরে হেসে ওঠে।— 'তুমি পাগল হয়ে গেছো বুবু। তুমি ডাক্তার দেখাও। যে ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছো, তাকেই দেখাও'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর শওকতের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। আজ শওকত যমুনার চেয়েও বেশি আপন। শওকতও সে চোখে তাকায় যমুনার দিকে, যে চোখে নূপুরও দেখে অবজ্ঞা আর ঘৃণা। নূপুরের চোখে যতটা তার চেয়েও দ্বিগুণ।

— 'আপনি আমার ছেলেকে নিয়ে ডাক্তার দেখানোর প্ল্যান করছেন কেন ? আমার ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিতে হলে আমি নিয়ে যাবো। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হলে আমি করবো। আপনার তো এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই ! আপনি বেড়াতে এসেছেন নিউইয়র্কে, বেড়িয়ে চলে যান। কোথায় কার সঙ্গে না কি দেখা করবেন, দেখা করুন। ব্রডওয়ের নাটক নাকি দেখবেন, দেখুন। বই কিনবেন বলেছিলেন, বই কিনুন। আমার ছেলেকে প্লিজ ছাড়ুন। ছেলের বাবা মা আছে, তারা ছেলের ভালো চায়। বাবা আর মা'র মতো শুভাকাংক্ষী তো আর কেউ হয় না। তাই না ? আপনি মাঝে মাঝে ভুলে যান যে আপনি ওর মা নন, আপনি খালা'।

যমুনা সোফায় ধপাশ করে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি খালা, আমার এত নাক গলানো তোমরা কেউ চাইছো না, আমি বুঝতে পারছি। শুধু বুঝতে পারছি না, তোমরা কেন চোখ বন্ধ করে আছো। জয় ইস্কুলে যাচ্ছে না। কিছু একটা খেয়ে বা কিছু একটা পান করে, বা কিছু একটা ইনজেক্ট করে ও ঘুমোচ্ছে, বাকিটা সময় আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকছে। না দেখার ভান করো না। কবে থেকে এমন হচ্ছে ? কবে ও ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। আমাকে তোমরা কিছু জানাওনি'।

— 'কিছু হলে তো জানাবো। জোর করে কেন ভাবতে চাইছেন যে কিছু একটা হয়েছে' !

জয়ের ঘরে ঢুকে যমুনা জিজ্ঞেস করে, তুমি ইস্কুলে যাওনা কেন ?

— 'ইচ্ছে করে না'। জয়ের সোজা উত্তর।

— ছুটি চলছে ?

— নট রিয়েলি।

— তুমি কি কোনও ড্রাগ ইউজ করো ? ঠিক করে বলোতো।

— ইউ আর এ ফাকিং ইডিয়ট, অ্যান ওল্ড রিটার্ড। হোয়াই ডোন্ট ইউ জাস্ট লীভ মি এন্ড মাই পেরেন্টস এলোন ! উই ডোন্ট নীড ইউ। লিসেন লেডি, উই একচুয়ালি হেইট ইউ। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ ? ইফ আই টেইক ড্রাগস, আই টেইক ড্রাগস। ইটস নট ইওর ফাকিং বিজনেস।

যমুনা হাঁ হয়ে গেছে জয়ের কথা শুনে। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের ছেলে এভাবে কথা বলে, বলতে পারে ! আসলে যমুনার আস্থা বেশি ছিল জয়ের ওপর। নূপুর আর শওকতের ওপর যা ছিল তার চেয়েও বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়ের সঙ্গে কিছু হলেও সখ্য ছিল যমুনার। ভালোবাসা তো আকাশ থেকে পড়েনি। খুব ছোট যখন জয়, তখন জয়কে অনেক গল্প শোনাতে হত। ভুতের গল্প যমুনা কখনও শোনায়নি। করত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গল্প। খুব মন দিয়ে শুনতো জয়। প্রশ্ন করতো।

যমুনার খুব ন্যাওটা ছিল তখন। জয়ের যখন পাঁচ ছ বছর বয়স, ওই অতটুকুন ছেলেকে যত মিউজিয়াম আছে যমুনা নিয়ে গিয়েছিল। মেট্রোপলিটান, গুগেনহাইম, মডার্ন। শহরের বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে রাজ্যির বই কিনে দিয়েছে, নূপুর দেখে বলেছে, এত বই রাখার জায়গাই তো নেই। আর ও তো এসব বড়দের বই পড়তে পারবে না।

যমুনা বলেছে, 'বড় হলে পড়বে। এখন ক্লাসিকসগুলো সব রইলো হাতের কাছে। তপুকে যত বড়দের বই গিফ্ট করেছিলাম, সব এখন বড় হয়ে পড়ছে। জয়ও পড়বে'।

— 'মিউজিয়ামের কী বোঝে ও ? এতক্ষণ বাইরে, নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছিল ওর'।

যমুনা বলেছে, 'তুই শুধু এর পেটে খাবার ঢোকাতে পারলেই খুশি। মিউজিয়ামের কী বোঝে মানে ? বাচ্চারা যা দেখে, যা শোনে, তা-ই মাথায় ঢুকে যায়। আমাদের মাথাতে অত ভালো কিন্তু ঢোকে না'।

জয় তার মা'র সঙ্গে নয়, বেশি থাকতো যমুনার সঙ্গে। যমুনা যতদিন ছিল, ছায়ার মতো জয় ছিল। তারপর জয়কে আরও দেখেছে, কিন্তু লক্ষ্য করতো জয় আগের মতো আর ঘেসছে না কাছে। ছেলেরা বড় হলে এরকমই হয়, ভেবে নিয়েছিল।

সেই যে দু'শ ক্লাসিকস কেনা হয়েছিল, সেই বইগুলো ঘরে জায়গা নেই বলে নূপুর খাটের তলায় কিছুদিন রেখেছিল, ঘরে ছারপোকা পাওয়া যাওয়ার পর সবই বই ফেলে দিয়েছিল। যমুনা বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতো, 'আর বোলো না, এত ছারপোকা, সব গারবেজ করে দিতে হল'। যমুনার মন খারাপ হয় শুনে।

জয়, যমুনার মনে হয়, মনে রাখেনি এই যমুনার সঙ্গে তার এক সময় খুব ভাব ছিল। খুব বেশি যমুনার সঙ্গে দেখা হয়নি জয়ের। তবু যতটুকুই হয়েছে, জয় খুব বুদ্ধিমান ছেলে, জয় বড় হলে বিরাট কিছু হবে বলে তপুর চেয়েও বেশি জয়কে নিয়ে মেতেছে। তপুকে সম্ভবত জয়ের মনেও এখন নেই। জয় থেকে সাত বছরের বড় তপু। না, তপু এভাবে কোনওদিন কথা বলেনি। এভাবে কথা বলতে তপু জানে না। এই শব্দগুলো কখনও উচ্চারণ হয় না বাড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত অপমান সয়েও যমুনা থাকে নূপুরের বাড়িতে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, ব্রডওয়ের নাটক দেখা, বই কেনা –সব কিছু বাতিল করে জয়কে নিয়ে পড়ে থাকে। তার সোজা কথা, ড্রাগের নেশা এখনই ছাড়াতে হবে, কোকেন, হিরোইন, হোয়াটএভার, এখন না ছাড়ালে পরে আর ছাড়ানো যাবে না, যে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।

জয়ের ঘরের ড্রয়ার খুলে যমুনা দেখেছে, অচেনা সব বড়ি। পাউডার। জয় বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কিছু এনে সে নূপুর আর শওকতকে দেখিয়েছেও, জিজ্ঞেস করেছে, এগুলো কী ?

দুজনেরই বক্তব্য এগুলো এন্টিবায়োটিক, প্যারাসিটামল। জ্বর টর হয়। ইনফেকশন দাঁতে, হাতে ইত্যাদিতে লেগেই আছে, সে কারণে।

'কে দিয়েছে ওকে এসব ওষুধ ? ও কি নিজে নিজে ডাক্তার দেখিয়েছিল ? নিজেই ওষুধ কিনেছে ?' জয়এর কেন এত ইনফেকশন হচ্ছে ! যমুনা কোনও ইনফেকশন জয়ের শরীরে দেখেনি। ও নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। জয়এর ব্যবহার তার ত্রিবান্দ্রাম অফিসের এক কলিগের মতো। ঠিক এভাবে টলতো, সম্পূর্ণ চেতন কখনও ছিল না, কাকে কী বলছে, কেন বলছে, ঠিক বুঝতে পারতো বলেও মনে হয়নি। পরে ধরা পড়লো মাদকসেবনের কারণে এমন হচ্ছে। ছুটি দেওয়া হল, ডাক্তারের কাছে যাও, না যাবে না। দিব্যি নাকি আছে। শেষ অবধি যখন অচেতন অবস্থায় ধেই ধেই করে বাড়তে থাকলে ধরে বেঁধে অফিসের লোকেরাই রিহ্যাবে রেখে এল। জয় টলছে দেখলে শৈলেন্দ্রর টলোমলো পায়ের কথা মনে পড়ে যমুনার।

একসময় ঘুম থেকে উঠে টলোমলো পায়ে জয় যখন টয়লেটে যাচ্ছে, যমুনা জিজ্ঞেস করেছে, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার, জয়। তোমার সময় হবে ?'

জয় টয়লেটে অনেকক্ষণ কাটালো, দূর থেকে যমুনা অস্থির হচ্ছিল ক্রমশ। টয়লেটে অতক্ষণ কী করছে ও। প্রায় আধঘণ্টা পার হওয়ার পর টোকা দিল যমুনা দরজায়। টেনশনে ঘামছিল সে। নূপুর রান্নাঘরে। শওকত বাড়ির বাইরে। 'জয়, এতক্ষণ কী করছো বাথরুমে। তুমি তো গোসল করছো না। করছো টা কী শুনি। আমি বাথরুমে যাবো, দরজা খোল'।

দরজা তার পরেও খোলে না। আরও মিনিট কুড়ি পেরোলে দরজা যখন খোলে, জয়ের সারা মুখ ঘামছে, আর হাঁফাচ্ছে। যেন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। জয়কে একটা টাওয়েল দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। সারা গা কাঁপছে তখন তার।

যমুনা জয়ের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'জয়, তুমি যদি এসব ছাড়তে না পারো, আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি। তোমাকে তো বাঁচতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে, তাইনা ? তোমাকে তো বাঁচতে হবে'। যমুনার চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে। হাতের পিঠে মুছতে মুছতে জল, যমুনা বলে, 'তুমি যদি একা একা এসব ছাড়তে না পারো, তাহলে ছাড়ানোর জন্য সাহায্য করা হবে, তুমি সাহায্যটা প্লিজ নাও'। না, সাহায্য সে নেবে না। কারণ এই জীবনকে সে ভালোবাসে না। সবাইকে ঘৃণা করে সে। নিজেকেও। অবশমতো হতে থাকে শরীর। বার বার বলতে থাকে, 'আই হেইট এভরিবডি'। জয়ের কাছে বসেই ছিল যমুনা। নূপুর ডেকে নিয়ে যায়। 'সারারাত লেখাপড়া করে ছেলে, দিনের বেলায় একটু ঘুমোয়, এই ঘুমটাকেও আর নষ্ট করো না'। যমুনাকে বের করে জয়ের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় নূপুর।

'ওকে একটু দয়া করে একা থাকতে দাও। জ্বরে ভুগছে। কিছু খেতে চাইছে না'। যমুনা লক্ষ্য করেছে নানারকম খাবার রান্না করে জয়ের মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে নূপুর, কিন্তু সব কিছুই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে জয়। বাইরের রেস্টুরেন্টের খাবার যা যা পছন্দ করে, সবই আনিয়ে দেখছে খায় কি না। না খেলে ফেলে দিচ্ছে সব, কিন্তু একবারও নূপুরের সন্দেহ হচ্ছে না যে জয় স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

AMARBOI.COM

যমুনা ছেড়ে দেয় না। ছলে বলে কৌশলে জয়কে রিহ্যাবে নেওয়ার বুদ্ধি আঁটতে থাকে। আত্মীয়দের বলে কোনও ফল হয়নি, শেষ অবধি ডাক্তারের পরামর্শে ৯১১ এ ফোন করে। ঘরে অল্প বয়সী ছেলে, আচার ব্যবহার কথাবার্তা স্বাভাবিক নয়, মনে হচ্ছে ড্রাগ অ্যাডিক্ট। ড্রয়ারেও পাওয়া গেছে ড্রাগস। সম্ভবত ড্রাগসই নিজেও স্বীকার করলো। এত ঘুমাচ্ছে কেন, ওভারডোজ হচ্ছে কি না। বাড়ির কেউ নিরাপদ বোধ করছে না...

কেউ নিরাপদ বোধ করছে না, এই বাক্যটির দরকার ছিল। না হলে ৯১১ নাক গলাবে না। ৯১১ র লোক গিয়েছিল বাড়িতে। যমুনা চেষ্টা করেছে নূপুর আর শওকতকে বোঝাতে। নিয়ে যাক জয়কে, ডাক্তার দেখুক। যদি কোনও অসুখবিসুখ না থাকে, তা হলে তো ভালোই। আর যদি থাকে, তাহলে এই সুযোগে চিকিৎসাটা হয়ে যাবে।

—'বুবু, তুমি আমার সর্বনাশ করছো, একটা সুস্থ ছেলেকে রোগী বানাচ্ছো, ড্রাগ এডিক্ট এর অপবাদ দিচ্ছ। ওর ভবিষ্যত নষ্ট করছো। তোমাকে আমি ক্ষমা করবো না কোনোদিন। তুমি আমার বোন, ভাবতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। তুমি চলে যাও এ বাড়ি থেকে। আজই। আমার সংসার নষ্ট করতে, আমার ছেলের সর্বনাশ করতে তুমি আর এসো না। তুমি তো খুনী। ঠিক না ? খুন তো করেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাকে। তুমি ছেলেদের সহ্য করতে পারছো না। আমার ছেলেকে খুন করতে চাইছো। আমার ছেলে কী ক্ষতি করেছিল তোমার ?'

৯১১ এর লোকদের ঢুকতেই দেয়নি নূপুর আর শওকত জয়ের ঘরে। বলে দিয়েছে, জয় অত্যন্ত ভালো ছেলে, পড়াশোনা করছে মন দিয়ে। ওদের বাড়িতে একটা পাগল মাথার মহিলা দেশ থেকে এসেছে, সে-ই জঘন্য সব কাণ্ড করেছে, ৯১১ এ কল করেছে। সবকিছুর জন্য পুলিশের কাছে নূপুর অত্যন্ত ভদ্রভাবে ক্ষমা চেয়ে নেয়। পুলিশ চলে যায়।

যমুনা শান্ত করতে চেয়েছিল নূপুরকে, জড়িয়ে ধরে। যমুনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে নূপুর। ধাক্কা খেয়ে যমুনা উল্টে পড়েছে। তারপরও অসন্তুষ্ট না হয়ে, রাগ না করে নূপুরকে আদর করতে চেয়েছে পিঠে হাত বুলিয়ে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই একটু শান্ত হ। আমার ওপর দায়িত্ব দে। এই ভাবে আমাকে ভুল বুঝিস না। তোরাই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। যা বলছি জয়ের ভালোর জন্য বলছি'।

শওকতকে কোনওদিন এত ভয়ংকর হতে দেখেনি যমুনা। বাড়ির দরজা জানালা কাঁপে এমন জোরে সে চেঁচায়। 'আমার ছেলের ভালো আপনাকে বুঝতে হবে না। দয়া করে আমার ছেলের ভালো মন্দ আমাকে বুঝতে দিন। আমি ওর বাবা, বুঝলেন আমি ওর বাবা। আপনি জয়কে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন না। উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। জয়কে জন্মের পর থেকে আপনি মানুষ করেছেন নাকি আমি করেছি ? আপনি ওর বাড়িঘর খাওয়া দাওয়া কাপড় চোপড় ফোন কম্পিউটারএর খরচ দিয়েছেন নাকি আমি দিয়েছি ? এখানে এখন আত্মীয়তা দেখাতে এসেছেন। এই ফ্ল্যাট আমার। আমি বলছি এক্ষুনি আপনি সুটকেস প্যাক করুন। আপনি চলে যান। আমার ছেলের জন্য আপনি ৯১১ ডেকেছেন। কত বড় সাহস আপনার। আমার ফ্ল্যাটে বসে আপনি আমাকে কত বড় অপমান করছেন'।

নূপুর শওকতের সুরে সুর মিলিয়েছিল।

এরপর আর থাকা সম্ভব হয়নি যমুনার। দ্রুত সে সুটকেস গুছিয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়।

কাছাকাছি কোথাও একটা হোটেলে ওঠে। কাছাকাছিই। কারণ যদি জয়ের জন্য তাকে দরকার জয়। যমুনা পারতো টিকিটের তারিখ এগিয়ে আনতে। কলকাতায় চলে যেতে। যায়নি। তারিখ এগিয়ে তো আনেইনি, বরং আরও কয়েকদিন বাড়িয়েছে থাকা। আরও দুসপ্তাহ যমুনা কাটায় হোটেলে। একটিই কারণ, একদিন নূপুরের ফোন আসবে, বলবে শিগরি এস, জয় যেন কেমন করছে।

জয় কেমন করছে, এই ভয়টা যমুনার সাংঘাতিক। অনেকবার মনে করেছে নূপুরের কাছে গিয়ে আবার নূপুরকে বোঝায়। জয়ের ওভারডোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি ঘটতে থাকে, ও হয়তো চোখ আর খুলবে না কোনওদিন। নূপুর আর শওকত সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা থেকে বলছে, যা বলছে। ওদের অজ্ঞানতা, মূর্খতাকে মূল্য দিয়ে অভিমান করে দূরে বসে থাকা কি ঠিক হচ্ছে ! যমুনার যদি নেশাগ্রস্ততা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকতো তাহলে নিজেও হয়তো সে বুঝতো না কী ঘটছে। নূপুরের মতো মাথা ঘুরছে, শরীরটা খারাপ, ইনফেকশান হয়েছে, পেটে কোনও খাবার সইছে না, বদহজম হচ্ছে, এসব বলতো। নূপুর আর শওকতকে খুব দোষ যমুনা দিতেও পারে না। শুধু জয়কে বাঁচানোর তাগিদ সে এত কিছুর পরও অনুভব করে। চরম নির্লজ্জের মতো নূপুরকে সে ফোনও করেছে। নূপুর ফোন ধরেনি। তারপর থেকে সে এসএমএস করে চলেছে, জয়ের নেশা ছাড়ানোর জন্য কী কী করতে হবে, তার উপদেশ। নূপুর যেন উপদেশ মানে। যমুনার প্রয়োজন না থাকলে না থাকুক, যাবে না সে। কিন্তু কয়েকজন ডাক্তারের নাম ঠিকানা সে এসএমএস করে দেয়। দু'সপ্তাহে একবারও কোনো ফোন ব্যাক করেনি, কোনও এসএমএসের উত্তরও দেয়নি নূপুর। যমুনার বিশ্বাস নূপুর নিজের ভুল বুঝতে পারবে একদিন। ততদিনে যেন দেরি না হয়ে যায়।

দু'সপ্তাহ পর কলকাতা ফিরে এসে যমুনা জয়কে নিয়েই দুশ্চিন্তা করতে থাকে। ফোন করে দেখেছে, নূপুর ধরছে না। ইমেইল করে দেখেছে, ইমেইলের উত্তর দিচ্ছে না। জয়ের ওই করুণ অবস্থা দেখে তার মনে হয়েছে, জয় সবাইকে আকুল হয়ে দিন জানাচ্ছে ওকে বাঁচাতে। বাইরের মানুষ বোঝে এ ড্রাগের আসক্তি, শুধু নিজের বাবা মা-ই বোঝে না। হয়তো বোঝে, কিন্তু বাস্তবকে গায়ের জোরে অস্বীকার করতে চায়। অথবা একটা চমৎকার জগত তৈরি করে নিয়েছে মনে মনে, সেই জগতেই বাস করছে বলে বিশ্বাস করছে। নূপুরকে কয়েকটা ইমেইল পাঠিয়ে দেয় যমুনা। কারণ কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে পরে নূপুরই কেঁদে কেঁদে বলবে, 'বুবু তুমি কেন আমাকে তখন আরও ভালো করে বুঝিয়ে বললে না, ছেলেটা তো বাঁচতো। আমাকে কেন মারলে না, কেন জোর করে তুমি নিয়ে গেলে না ডাক্তারের কাছে। আমরা না হয় বুঝতে পারছিলাম না, আমরা বোকা, আমরা গাধার মত কাজ করি পয়সার জন্য, দুনিয়ার খবর কিছু রাখি না। ড্রাগস কাকে বলে, দেখতে কেমন, খায় কেন, খেলে কী হয়, কিচ্ছু জানি না। তুমি তো জানতে। জেনেও কেন যে করেই হোক জয়কে বাঁচালে না। তুমি তো দেখতে পাচ্ছিলে। আমরা না হয় অন্ধ ছিলাম'। দোষ থেকে বাঁচার জন্য নয়, যা করে যমুনা অন্তর থেকেই করে। জয়কে বাঁচাবার জন্য করে, জয় মরছে বা মরে যাবে এরকম কোনো আভাস নেই, কিন্তু ভেতরে যে ভয়ংকর একটা আশংকা বাসা বেঁধেছে, সেই আশংকা থেকে করে। যে আশংকা তপুর বেলাতেও ছিল। পাশা তপুকে মেরে ফেলতে চাইছিল, একটা বউ বাচ্চা নিয়ে সুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার করা লোকের গোপন কোনও ঔরসজাত সন্তান আছে কোথাও, এই ঘটনা প্রথম প্রথম পাশা মেনে নিলেও পরে আর পারছিল না, তখন যমুনারও সময় ছিল না পাশাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার। যমুনা পাশার ওই বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থা, ভয় আর আশংকায় দিন রাত আচ্ছন্ন হয়ে থাকা, — এসবের সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। যমুনা লক্ষ করছিল তপুকে পাশা আর সহ্য করতে পারছে না। তপুর দিকে ভয়ংকর চোখে তাকিয়ে থাকতো, কোলে নিয়ে খেলার ছলে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিত, ধরতো কিন্তু যেন না ধরলে কী ঘটে, তাও একটু পরখ করতে চাইতো।

যমুনার অনুপস্থিতিতে ঘন ঘন যমুনার ফ্ল্যাটে এসে পাশার বসে থাকা যমুনার ভালো লাগতো না। যমুনা ভাবতো তপুকে ভালোবেসে আসে, যত হোক নিজের সন্তান তো। কিন্তু ফুলি কথায় কথায় পাশার ওই তপুকে নিয়ে ছোড়াছুড়ির অস্বস্তিতর ঘটনার বর্ণণা করার পর গা ঠাণ্ডা হয়ে যায় যমুনার। তবে কি পাশা তপুকে ভালোবেসে নয়, না-ভালোবেসে আসে ! তপুর জন্ম হওয়াটা পাশা পছন্দ করেনি। কিন্তু যমুনা ভেবেছে, জন্ম হওয়া তো কত বাবা কত মা-ই চায় না, কিন্তু শেষ অবদি ভালবাসা ধীরে ধীরে জন্ম নেয়।

পাশার কাছে ফ্ল্যাটের যে চাবিটা থাকে সেটা প্যান্টের পকেট থেকে যমুনা একদিন নিয়ে নিল। পাশা পরে চাবি যখন খুঁজে পাচ্ছে না, যমুনাই বললো 'আমি আসলে চাই না তুমি খালি বাড়িতে যাও। আমি অফিস থেকে ফিরলেই না হয় এসো। তোমারও তো অফিস আছে'।

— 'মানে ?'

— 'মানে আবার কী। না বোঝার তো কিছু নেই। আমি চাই না আমি যখন নেই, তুমি আমার ফ্ল্যাটে যাও। তোমার যাওয়াটা ঠিক ভালো দেখায় না। ঘরে অল্পবয়সী কাজের মেয়ে। আজকাল কত রকমের ঘটনা ঘটে'।

— 'তার মানে তুমি কি বলতে চাও ফুলিকে আমি রেইপ করবো ?'

— 'সেটা তো বলিনি'।

— 'সেটা বলনি, তো কেন বললে আজকাল কত রকমের ঘটনা ঘটে'।

— 'নূপুর ঘরে থাকলে ঠিক আছে'।

— 'কেন ঠিক থাকবে, আজ ফুলিকে নিয়ে বলেছো, কাল নূপুরকে নিয়ে বলবে'।

— 'এসব ইম্পর্টেন্ট কথা নয়'।

— 'তবে ইম্পর্টেন্ট কথা কী শুনি ! ছোটলোকের মত তো কথা বলেই যাচ্ছো। ছি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— 'তপুকে খুব ভালোবাসো বুঝি ?'

— 'বাসিই তো। ওর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে, ফাঁক পেলেই চলে আসি'।

— তা'ই বুঝি। ওর জন্মটাই তো চাওনি। অ্যাবরশনের কথা কত বার বলেছো। তপুকে ভালোবেসে তপুকে স্পর্শ করেছো, কোনোদিন দেখিনি। তপু দেখতে তোমার মত হয়েছে, এ যেন তুমি আরও সইতে পারছো না। তোমার বোধ হয় ইচ্ছে করে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে ওর মুখটা কেটে কেটে একটু পাল্টে দিতে, যেন তোমার মেয়ে হিসেবে কোনওদিন ওকে কেউ ধরতে না পারে, তাই না ?'

— 'যমুনা তুমি জানোনা তুমি কী বলছো। তপু জন্ম নেওয়ার পর থেকে তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছো না। সারাক্ষণই আমাকে শত্রু বলে মনে করছো। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই না ? তুমি একটা আস্ত স্বার্থপর। আমার আজকাল পাগল পাগল লাগে। সংসার ওদিকে। এদিকে তুমি, তপু। আমি কোনদিকে যাই বলো'।

— 'তুমি ওদিকে যাও। ওদিকে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। তুমি আর আমি বিয়ে করিনি। তপু অফিসিয়ালি আমার মেয়ে, তোমার সঙ্গে বেসরকারি আত্মীয়তা আছে, সরকারি আত্মীয়তা নেই। তুমি নিশ্চিন্তে সংসার করো'।

সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যেত যমুনার। পাশা তপুকে নিশ্চিহ্ন করার এই পরিকল্পনা করছে, ফুলির ঘাড়ে সবটা দোষ চাপিয়ে সে দিব্যি ভালোমানুষ বনতে চাইছে, তা বুঝতে যমুনার অনেকদিন সময় লেগেছে। মানুষকে হঠাৎ করে অবিশ্বাস করতে অসুবিধে হয় যমুনার। বিশেষ করে যে মানুষ দীর্ঘদিন পাশে ছিল, দীর্ঘদিন যে মানুষ শুধু মানুষ নয় সবচেয়ে কাছের মানুষ, প্রেমিক ছিল।

তপুকে বাঁচাতে যা কিছু করার প্রয়োজন ছিল, যমুনা করেছে। একবারও তার অনুতাপ হয়নি পৃথিবীতে পাশা বলে কেউ নেই বলে। যমুনা ঠিক নিশ্চিত নয় পাশা কী কারণে অতটা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, সে কি আসলেই নিজের সংসারের কথা ভেবে যে ওর বউ বাচ্চা বড় হয়ে যদি জানতে পায় যে পাশা অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে শুয়ে একটা বাচ্চা করেছে অন্য বাড়িতে, তাহলে আত্মীয় স্বজনের সামনে আর মুখ দেখাতে পারবে না ! এতই যদি মুখ দেখানো নিয়ে সমস্যা পাশার, পাশা কি করে তবে বছরের পর বছর প্রেম করতো যমুনার সঙ্গে ! ওভাবে প্রায় স্বামী স্ত্রীর মতো বাস করতো ! রাতে হয়তো ঘুমোতে যেত বাড়িতে, কিন্তু অফিসের বাইরে যেটুকু সময় বাঁচে, তার বেশির ভাগ সময়ই তো যমুনাকে নিয়ে কাটাতো। হঠাৎ করে এত বড় পুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবিত্র হওয়ার বাসনা কেন পাশার ! পাশাও তো সমাজের চোখ রাঙানো, কানাঘুষা, গুঞ্জন এসবকে তুচ্ছ করেছিল !

যমুনার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। নাকি যমুনা দূরে সরে যাচ্ছিল বলে ! তপুর জন্ম নেওয়ার পর পাশাকে হয়তো ধীরে ধীরে জীবন থেকেই সরিয়ে দেবে, এই আশংকায় কি পাশা তপুকে নিশ্চিহ্ন করে যমুনাকে আগের মতো ফিরে পেতে চেয়েছিল ! আজও যমুনা জানে না। পাশার জন্য যমুনার বুকের ভেতর অদ্ভুত এক মায়া কাজ করে। যমুনা করুণার সাগর হতে পারে, আবার হতে পারে কঠিন পাথর। মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজেকে সে এখনও আবিস্কার করছে। এখনও সে একটু একটু করে নিজেকে চিনছে। তপুকে বাঁচাতে সে পাশাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নূপুর ময়মনসিংহে তখন। তপুকে নিয়ে ফুলি থাকে ঘরে। সেদিন যদি হঠাৎ করে দুপুরবেলা ঘরে না ফিরতো যমুনা, তপুকে বাঁচাতে পারতো না। যমুনা গভীর ভাবেই বিশ্বাস করে পারতো না বাঁচাতে। এর মধ্যে হয়তো কিন্তু নেই। সেদিন সকালে নূপুর ময়মনসিংহ থেকে জরুরি টেলিফোন করে যমুনার অফিসে, এক্ষুণি তাকে কোনও এক সার্টিফিকেটের কোনো একটা নাম্বার আর কোনও একটা তারিখ জানাতে হবে। সেগুলো নিতেই যমুনার ঘরে আসা, আর ঘরে এসেই দেখা, বাড়ি ঘর ওলোট পালোট। ফুলি বাথরুমে, তপু বারান্দায় একা, কাঁদছে চিৎকার করে। তপুকে কোলে তুলে নিয়ে দেখে মুখ নীল হয়ে আছে, মাথায় আঘাতের চিহ্ন, সারা গায়ে নখের দাগ, গলায় পাঁচ আঙুলের বসে যাওয়া রক্ত জমা লাল দাগ। যমুনা ফুলিকে ডাকতে ডাকতে দেখে ও ভেতরে বসে আছে বাথরুমের। দরজা ধাক্কাতে থাকলে একসময় খোলে ফুলি দরজা কিন্তু সারা মুখে আতংক। দৌড়ে সে অন্য ঘর থেকে নিজের ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দরজার দিকে দৌড়ে যায়, পেছন থেকে খপ করে ধরে ফুলিকে পেছনে টেনে আনে যমুনা। এক ঝটকায় ব্যাগটা হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

'আমি কিচ্ছু জানি না, যা করার পাশা ভাই করেছে'। বলে ফুলি কাঁদতে থাকে জোরে। এমন জোরে কাঁদলে যে কারও ধারণা হবে ফুলিকে পেটানো হচ্ছে।

তখনও বোঝেনি যমুনা পাশা কী করেছে। তার ধারণা হয় পাশা ফুলির সঙ্গে কোনও যৌন সম্পর্কের চেষ্টা করেছে। কিন্তু তপুর এই হাল কে করেছে! খাট থেকে ফেলে দিয়েছিল ! দাঁতে নখে তপুকে ছিঁড়েছে, কিছু একটা ঘটেছে, সেটা কী ঘটেছে ! ফুলিকে টেনে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে যমুনা জিজ্ঞেস করছে, কাঁপছে তার শরীর, উত্তেজনায়, রাগে। তপুর মুখে জল, জলের বোতলটা ধরতে ধরতেই ফুলি হাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুলি হাওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাগ নিয়ে নয়। ব্যাগে দশ হাজার টাকা। কোথায় পেয়েছে ফুলি টাকা ? যমুনার নিজের কোনও টাকা পয়সা চুরি হয়নি। তবে ফুলির হাতে টাকাটা এল কী করে ! তখনও যমুনা সবচেয়ে মন্দ যা হতে পারে, সেই আশংকাটি করেছে, ফুলির সঙ্গে, একটা ষোলো সতেরো বছরের কিশোরীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক পাশা টাকা দিয়ে কিনেছে। সন্ধ্যেয় যমুনার সঙ্গে, রাতে নিজের বাড়িতে নিজের বউএর সঙ্গে আর দুপুরে লাঞ্চ আওয়ারের সময় বা ফাঁক পেলে তপুকে দেখার নাম করে ফুলির সঙ্গে। তখনও যমুনা জানে না যে এ আসলে তপুকে মেরে ফেলার ঘুষ। তখনও যমুনা মন্দটাই ভাবছে, চূড়ান্ত মন্দটা ভাবতে পারেনি।

ফোন করে যমুনা পাশার অফিসে, — 'তুমি আজ এসেছিলে আমার ফ্ল্যাটে'।

'সকালে অফিসে আসার পথে একবার ঢুঁ দিয়ে এলাম। ফুলি ঠিকমত তপুকে দেখছে কি না...'

'ফুলির ব্যাগে টাকা কেন ?'

'টাকা ?'

'হ্যাঁ টাকা..'

'তুমি কি ওর সঙ্গে.'.

'কী ওর সঙ্গে ?'

'ওর সঙ্গে শুচ্ছ ?'

AMARBOI.COM

'হা হা হা হা। যমুনা তুমি পাগল হয়ে গেছ। আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ। তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আর আমি তোমার কাজের লোকের সঙ্গে শোবো। তাও আবার টাকা দিয়ে। দশ টাকা দিয়ে বাইরে ভারজিন পাওয়া যায়, ফর ইওর ইনফরমেশন। দশ হাজার টাকা লাগে না, ইডিয়ট'।

হ্যাঁ ঠিকই। যমুনা পাগল হয়ে গেছে। যমুনা একটা ইডিয়ট। ফুলির মতো একটা মোটা সোটা কালো মেয়েকে যে মেয়েদের অসুন্দর বা কুৎসিত বলে বিবেচনা করে, তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে শোবে, যেখানে মাগনা শুতে পারছে যমুনার মতো সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে।

— 'তাহলে টাকা কোথায় পেল ফুলি ?'

— 'তা আমি কী করে বলবো ! বোধহয় দেশ থেকে এনেছে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— 'যার দশ হাজার টাকা আছে সে অন্য বাড়িতে কাজ করে না। সে দশ হাজার টাকা ফুরোলে পরে অন্যের বাড়ি কাজ করে'।

— 'একবার আমাকে বলছিলও যেন যে ওর বাবার নাকি কী একটা জমি ছিল, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি হয়েছে। চল্লিশ হাজার টাকা ওর মা নিয়েছে, ও নিয়েছে দশ। বলেছিল ও নাকি ব্যাংকে রাখতে চায় টাকা'।

— 'কই আমাকে তো বলেনি ? তোমাকে বললো কেন ?'

— 'এটার মধ্যেও তুমি সন্দেহ খুঁজে পাচ্ছো'।

-'আসলে কী জানো পাশা, পাচ্ছি'।

— 'সে তোমার প্রব্লেম'।

— 'শুধু আমার নয়। এ তোমারও প্রব্লেম। কিছু একটা হচ্ছে আমি যা জানি না। আমার অজান্তে কিছু একটা হচ্ছে'।

যমুনা ফোন রেখে দৌড়োয় ক্লিনিকে। তপুর সারা শরীর পরীক্ষা করে ডাক্তার বলেন, 'ওকে টরচার করা হয়েছে'। শরীরে বেশ কিছু ইনজুরি। ওর শ্বাস রোধ করারও সম্ভবত চেষ্টা হয়েছে। গলায় দাগ পাওয়া যাচ্ছে আঙুলের। শরীরের অনেক জায়গায় নখের আঁচড়। অনেক জায়গায় রক্ত জমে গেছে। ওকে কি মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল ? ডাক্তার বলেছেন, মেরে ফেলার কিনা বলা যাচ্ছে না, তবে বেবি মিসহ্যান্ডলড। কাজের লোকের কেয়ারে বাচ্চা থাকলে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনিবের ওপর রাগ কাজের লোক শোধ নেয় বাচ্চাকে টরচার করে'।

— 'কীরকম হাত বা আঙুলের দাগ, মেয়ের নাকি ছেলের'।

— -'কার হাতে আপনার মেয়েকে রেখে যান। কাজের মেয়ে তো ?'

— 'হ্যাঁ'।

— 'তাহলে মেয়ের'।

— 'তা কেন হবে। বাইরে থেকে কোনও ছেলে এসে হয়তো ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, হয়তো কাজের মেয়েই বাধা দিয়েছে'।

— 'হতে পারে। কিন্তু কে এমন একটা ছোট বাচ্চাকে মারতে আসবে ? আপনার কী অনেক শত্রু নাকি ?'

— 'খুব বেশি শত্রুর কী দরকার নাকি ? একজন হলেই তো হয়'। যমুনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারের চেম্বারে বসে। ডাক্তার মুচকি হাসেন। যমুনার মুখে একটা তেতো হাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— 'আপনার কি মনে হয় বাইরের কেউ করেছে ? তাহলে থানায় ডায়রি করুন। আর কাজের লোকের কাছে মেয়েকে একা রেখে যাওয়াটা একদমই রিউকমেন্ড করছি না। কিছু মলম লাগান, কিছু সিরাপ খাওয়ান বাচ্চাকে'।

যমুনা অফিস থেকে ছুটি নেয়। ফুলি কোথায় গেছে কিছুই জানে না সে। নূপুরকে ঘটনা জানায় ফোনে, দ্রুত চলে আসতে বলে। নূপুর দুদিন পর ফেরে। ওই দুদিন যমুনা তপুকে ছেড়ে এক মুহূর্ত কোথাও নড়েনি। ওই দুদিনেই অনেক কিছু ঘটে যায়।

যমুনার ফুলিকে দরকার। গহীন গ্রামের মেয়ে, ঢাকা শহরে কোনোদিন আসেনি। সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়।

পাশা এলে যমুনা পাশাকে প্রশ্ন করে।

— 'ফুলি কোথায় ?'

— 'সে আমি কী জানি'।

— 'তুমি নিশ্চয়ই জানো। টাকা দিয়েছো'।

— 'মানে ?

— 'তুমি ফুলিকে দশ হাজার টাকা দিয়েছো। তোমার সেক্স যদি এখানে ইস্যু না হয়, তাহলে তপুকে কিছু একটা করার জন্য টাকা দিয়েছো'।

— 'তুমি পাগল হয়ে গেছ যমুনা। তপু আমার মেয়ে'।

— 'তোমার মেয়ে, সে জানি। কত কত বাবা তাদের পাঁচ বছর তিন বছর এমন কী দু'তিন মাসের বাচ্চাকে রেপ করছে। দেখ না খবরের কাগজে?'

— 'তোমার জিভটা টেনে বার করে ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে'।

— 'আমার কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

পাশাকে মেরে ফেলতে যমুনা তখনও হয়তো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত তখন নেয়, যখন পাশা যমুনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তপুকে খাট থেকে উঠিয়ে শূন্যে ছুড়ে দেয়। তপুর মাথা মেঝেয় পড়েনি। মেঝেয় তোশক ছিল ফুলির, ওখানে লেগে বেঁচেছে। কিন্তু কাচের আলমারিতে ধাক্কা খায় শরীর। যমুনা দ্রুত তপুকে কোলে তুলে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যায় ফ্ল্যাট থেকে। কিছুক্ষণ তপুর জ্ঞান ছিল না। তপুকে বাঁচাতে হাতে টাকা নেই, পয়সা নেই, পায়ে জুতো নেই যমুনা দৌড়োয়। স্কুটার নেয়।

হয় তপু বেঁচে থাকবে, নয় পাশা। যমুনা তখন উন্মাদ। তপুর উড়ুর ভেতর ঢুকে গেছে কাচ। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সেই রক্ত বন্ধ করতে যমুনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেপে ধরেছে নিজের আঁচল দিয়ে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে পৌঁছে বেবি ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধু বললো, 'আমার বাসায় গিয়ে কাল ভাড়াটা নিয়ে নিও'।

টাকা লাগবে না আপা, আপনার বাচ্চাটারে বাঁচান।

আহ, এই গরিব বেবিট্যাক্সিওয়ালাও বাচ্চার জন্য মায়া আছে। শুধু বোধ হয় পাশারই নেই। যমুনা চেনা দুজন ডাক্তারদের হাতে বাচ্চাকে সঁপে দিয়ে ছোটে শান্তিবাগের দিকে। ফ্ল্যাটে গিয়ে তার টাকা আনতে হবে। প্রাইভেট হাতপাতালে আগে টাকা দিতে হয়। না দিলে চিকিৎসাই শুরু করবে না। চেনা বলে হয়তো কিছুটা খাতির করবে, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী, টাকা হাতে থাকা ভালো। স্কুটার দাড় করিয়ে রেখে সে ফ্ল্যাটে ঢোকে। দরজা হাঁ খোলা। ফুলিকে কয়েকবার ডাকে। হঠাৎ খেয়াল হয় ফুলি পালিয়েছে। ফুলির ব্যাগ আছে, ব্যাগে টাকা নেই। ঘরে পাশা নেই। তাহলে ব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে সেও পালিয়েছে। কোনও প্রমাণ আর রইলো না সে যে ফুলিকে টাকা দিয়েছে। যমুনার খুব ইচ্ছে করে ফুলিকে পেতে। ফুলিই সমস্ত জানে কী ঘটেছে। 'সব পাশা ভাই করেছে যা করেছে', ফুলি বলেছিল কেঁদে কেঁদে। কী করেছিল পাশা, ফুলি আর বলেনি। ভয়ে পালিয়েছে। একবার ফুলির সঙ্গে কথা বলা দরকার যমুনার। তার মাথা ঘোরে। ঘুরতে থাকে। ব্যাগ নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যায় যমুনা। বিন্নায় রাগে বার বার সে থুতু ফেলে। এই পাশা লোকটির সঙ্গে সে কতগুলো বছর কাটিয়েছে। কত কত দিন তাকে সে রেঁধে খাইয়েছে। পাশার কাপড় চোপড় কেচে ইস্ত্রি করে দিয়েছে। কত কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেছে। কতগুলো বছর সে পাশাকে বলেছে সে ভালোবাসে পাশাকে। জল উপচে ওঠে চোখে। চোয়াল শক্ত হয় যমুনার। দাঁতে দাঁত ঘসে। চোখের সামনে ঘটেছে, তারপরও তার অবিশ্বাস্য লাগে দৃশ্যটি, পাশা আজ তপুকে ছুড়ে মেরেছে মেঝেয়, যেন ও মরে যায়। বছর ওর এক বছর ছ'মাস মোটে। হাসপাতালে তপুকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে ডাক্তাররা। আলমারির কাচ ভেঙে ঢুকে গেছে উড়ুতে। শরীরের নানা জায়গায়। পাশা আজ তপুকে আঘাত করার জন্য ছুড়ে ফেলেনি। মেরে ফেলার জন্য করেছে। মেরে ফেলার ইচ্ছে তার অনেকদিনের। যমুনার আর কোনও দ্বিধা হয় না এটুকু বুঝতে যে ফুলিকে টাকাটা পাশাই দিয়েছিল যেন মেরে ফেলে তপুকে। আজ যদি তপু প্রাণে বেঁচে যায় তবে পাশার হাত থেকে বাঁচবে কী করে। পাশা তপুকে বাঁচতে দেবে না। পালিয়ে যমুনা যাবে কোথায়!

তপুকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রেখেছে। অক্সিজেন দিয়েছে। ক্ষতগুলো ড্রেসিং করেছে। শরীরে বিঁধে থাকা ছোট ছোট কাচ তুলেছে। মাথায় ব্যান্ডেজ করেছে। হাসপাতালে দু'দিন রাখতে হবে। ফ্ল্যাটে থাকার চেয়ে তপুর হাসপাতালে থাকাই এখন নিরাপদ। একটা আয়া রাখে যমুনা তপুর দেখাশোনা করার জন্য। অনেক রাতে বেরোয় সে। ঘরে পৌঁছে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশা। পাশা শুয়ে আছে বিছানায়। অন্য দিন এভাবে শুয়ে থাকা পাশাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতো যমুনা। পাশা ঘুরে যমুনাকে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে চুমু খেতো। উতল প্রেমে দুজন মেঘের ওপর ভাসার মতো ভাসতো আর রেইনবো ছুঁতো। আহ সেই রেইনবো রেইনবো খেলা। আজ অন্য খেলা খেলবে যমুনা।

ইলেকট্রিকের তার ছিল রান্নাঘরে। নিয়ে আসে। পাশা আজ তপুকে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটাবার পরও যমুনার ফ্ল্যাটে এসেছে, এর কী কারণ ! তার ভয় নেই ! এত নির্লজ্জ লোক যমুনা আর দেখেনি জীবনে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে কী, নাকি যমুনার সারেন্ডারের অপেক্ষা করছে। দুজনে ঝগড়া হওয়ার পর পাশার অভ্যেস উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা। আর অপেক্ষা করা যমুনা একটু একটু করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেবে। তার মানে যুদ্ধ নয়, ভালোবাসি চল, আপোস করি চল। পাশা কি ভেবেছে জীবনভর আপোস চলে ? কিছু কিছু তো বিষয় আছে আপোস করা যায় না।

পেছনে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে, কিছু খাবে ?

— 'না। তপু কোথায় ?'

— 'হাসপাতালে। কী হয়েছিল তোমার হঠাৎ করে তপুকে ফেলে দিলে কেন ?'

— 'আমি চাদর টান দিয়েছি, আমি তো দেখিনি তপুকে ওখানে শুইয়ে রেখেছো'।

— 'ও তা বলো, দেখোনি।

— 'তাই তো। ভালো আছে তো তপু ? কোন হাসপাতালে বল। দেখতে যাবো'।

— 'যেও। আমিই নিয়ে যাবো'।

— 'ভেবো না। সেরে যাবে। মাথায় তো চোট লাগেনি'।

— 'হ্যাঁ ডাক্তারও বলেছে, বেশি চোট লাগে নি। তারপরও আজ হাসপাতালে থাকুক। কাল সকালে নিয়ে আসবো'।

— 'ফ্ল্যাটের চাবি তো তোমার কাছে ছিল না। পেলে কোথায় ?' হেসে জিজ্ঞেস করে যমুনা।

পাশাও হাসতে হাসতে বলে—'জাদু জাদু !'

পেছনে হাত বুলোতে বুলতে পাশার দুটো হাত সে ইলেকট্রিক তার দিয়ে বেধে ফেলে।

পাশা ওই উপুড় হয়ে শুয়ে থেকেই বলে,

— 'বাঁধছো কেন ? লাগছে তো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্ত করে বেঁধে এরপর পা দুটোও তারে বেঁধে ফেলে।

— 'কী হচ্ছে কী !'

বেশ কয়েকবার পাশা তার নিজের হাত পা বেঁধেছে সঙ্গম করতে গিয়ে। পাশার শখ। এতে নাকি সে প্লেজার পায় বেশি।

যমুনা পাশার নিতম্বে হাত বুলোতে বুলোতে হাতখানা প্যান্টের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। পাশার গলা থেকে আদুরে শব্দ বেরোতে থাকে। পেছন থেকেই সে তার পায়ের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে পুরুষাঙ্গটির ওপর হাত বুলোয়। পাশা উল্টে শুতে যায়। যমুনা থামিয়ে দেয়। হাতটা অণ্ডকোষে বুলোয়। এবার চেপে ধরে সমস্ত শক্তিতে যমুনা। আর্তচিৎকার করে কুঁচকে কুঁকড়ে যেতে থাকে পাশা। দু হাতে চাপতে থাকে যমুনা। যমুনা মিউজিক চালিয়ে দিয়েছিল, এবার শুধু এক হাত বাড়িয়ে মিউজিকটা বাড়িয়ে দেয়, যেন পাশার আর্তচিৎকার বাইরের কেউ শুনতে না পায়। পাশা গোঙাতে থাকে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে। মুখ হাঁ করিয়ে যমুনা হুইস্কি ঢালতে থাকে মুখে। প্রায় আধ বোতল র' হুইস্কি সে গেলায় পাশাকে দিয়ে। এরপর দু'চাক পাউরুটির মধ্যে ইদুর মারার ওষুধ ঢুকিয়ে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। দিয়ে বড় শক্ত টেপ লাগিয়ে দেয় মুখে। ছটফট করে চূড়ান্ত পাশা, না পারে ছিঁড়তে হাতের তার, না পারে পায়ের।

শরীর প্রায় নিথর হয়ে পড়ে যখন, যমুনা, হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। না মরেনি তখনও। শরীরটাকে টেনে গেটের ওপারে ছেড়ে দিয়ে আসে, বড় রাস্তা থেকে একটা রিক্সা বা বেবি ট্যাক্সি নিয়ে নাও। পাশা সামনের দিকে টলতে টলতে হাঁটতে থাকে। মাতাল বলে কেউ কেউ গালও দেয়। যমুনা চেয়েছে তার ত্রিসীমানার বাইরে গিয়ে মরুক।

পরদিন তপুকে হাসপাতালে দেখে যখন বাড়ি ফেরে দুপুরে, দেখে নূপুর এসেছে। নূপুরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো অনেকক্ষণ যমুনা। তারপর সব বললো সে নূপুরকে। সব। কত যে ধকল গেছে তার ওপর, নূপুরকে সব বলতে পেরে সে যেন মুক্তি পেল সেদিন। যমুনা নূপুরের জন্য ব্যাংকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছিল। চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে নূপুর ময়মনসিংহে গিয়েছিল কলেজের কিছু সার্টিফিকেট তুলতে, ঢাকায় ফিরেই দেখে সব ওলোট-পালোট। জগত বদলে গেছে।

নূপুর চুপ হয়ে শুনে বললো, বুবু, তুমি তপুকে নিয়ে আজই কোথাও চলে যাও।

— কোথায় যাবো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— দূরে কোথাও।

— দূরে কোথাও মানে ?

— আমার খুব ভয় হচ্ছে। তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে ওরা।

— কারা ?

— পাশার আত্মীয়রা।

— পাশা তো মরেনি। বোধ হয় ও মরেনি।

— কী করে জানো ও মরেনি ?

— হাঁটছিল তো। হাসপাতালে পৌঁছে যেতে পারলে তো মরবে না।

— 'রাস্তায় কোথাও হয়তো মরে রয়েছে। এক মুহূর্ত দেরি করো না। আমার ভয় হচ্ছে। সারাজীবন জেলে কাটাতে হবে, বা মৃত্যুদণ্ড হবে। তপুর জন্য বাঁচো। নিজের জন্য বাঁচো। পাশার মতো পাষণ্ড একটা লোকের জন্য নিজের জীবনটাকে নষ্ট করো না'।

নূপুরের উপদেশ যমুনা শুনেছিল। পরদিনই ভিসা, পরদিনই টিকিট। পরদিনই দিল্লি। নতুন একটা অদ্ভুত জীবন শুরু হয় তখন যমুনার।

পরদিন শান্তিবাগের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। নূপুর জানিয়ে দিয়েছে পাশা টাশার খবর কিছু সে জানে না। কিছুদিন গেলে যতটুকু জানতে পেরেছে, তা হল, পাশা নাকি শাহবাগের রাস্তার ধারে পড়েছিল। পুলিশ তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে তখনও সে কাতরাচ্ছিল। ডাক্তারদের স্ট্রাইক ছিল। তিন ঘণ্টা ইমারজেন্সিতে চিকিৎসাহীন অবস্থায় শুয়ে থাকার পর মারা গেছে পাশা। 'তক্ষুনি যদি স্যালাইন ট্যালাইন দেওয়া হত, বাঁচতো'। নূপুরের এক পরিচিত ডাক্তার এরকমই বলেছে। সেই ডাক্তার ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালেই চাকরি করে, যে মেডিকেলে পাশাকে নেওয়া হয়েছিল। পাশার আত্মীয়রা চায়নি কোনও পোস্ট মর্টেম করাতে। পোস্ট মর্টেম হয়নি। নূপুর স্বস্তির শ্বাস ফেলে। পুলিশ তিনদিন যমুনার খোঁজে শান্তিবাগে এসেছিল। নূপুরকে যমুনা ভেবে নানা রকম প্রশ্ন করে চলে গেছে। পাশার পরিবার থেকে চায়নি কেউ পাশার প্রেমিকা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে। পাশা সরকারি অফিসের মেকানিক্যাল ইঞ্জনিয়ার। স্ত্রী শিক্ষিকা। দুই পুত্র সন্তানের পিতা। সমাজে মান ইজ্জত আছে। মদ খেয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক তার ওপর আবার সরকারি বড় অফিসার রাস্তায় পড়ে থাকতো বা গোপনে কারও সঙ্গে প্রেম করতো বা শুতে যেত এসব জানাজানি হলে আর রক্ষে নেই। যে গেছে সে আর ফিরে আসবে না। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুশকিল। কেঁচো খোঁড়ারই দরকার নেই। মৃত্যুকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক মৃত্যু বানিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নূপুর ভাবতে থাকে তপুকে বাঁচানোর জন্য যে উপদেশ নূপুর যমুনাকে দিয়েছিল, যমুনা শুনেছিল। কিন্তু জয়কে বাঁচাতে যে উপদেশ দিয়েছিল যমুনা, তা নূপুর শোনেনি। জয়কে তাই বাঁচাতেও পারেনি নূপুর। যমুনা ছিল একটা নতুন দেশে একটা অসুস্থ বাচ্চা কোলে নিয়ে আসা কাউকে চেনে না, কাউকে জানে না একটা অসহায় মেয়ে। কতই আর বয়স ছিল যমুনার। যমুনা যখন বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে লড়ছে নতুন মাটিতে, নূপুর তার প্রেমিক প্রবর শওকতকে ধুমধাম করে বিয়ে করেছে। আত্মীয়-স্বজনের দোয়া আর আশীর্বাদ নিয়ে নতুন দম্পতি পাড়ি দিয়েছে আমেরিকায়। নূপুরকে নতুন মাটিতে একা সংগ্রাম করতে হয়নি। কোথায় শান্তিবাগ ! কোথায় দু'বোনের এক বাড়িতে বাকি জীবন হেসে খেলে ভালোবেসে যাপন করার স্বপ্ন ! আচমকা এক ভূমিকম্প এসে দু'দিকে দু'বোনকে ছুড়ে ফেলে দিল। শুরু করলো দুটো নতুন জীবন, দু'বোন দুদিকে।

নির্মলা ডাকে, নূপুর তুমি চা'টাও খাওনি। ও'তো জল হয়ে গেছে। তাই তো ! অনেকক্ষণ চা দিয়ে গেছে নির্মলা। নূপুর বসেই আছে নিচতলার সোফায়। ব্রজরা অনেকক্ষণ চলে গেছে। নূপুরের কোথাও যেতে ইচ্ছে করেনি, কিছু পান করতে বা খেতে ইচ্ছে করেনি। এবার তাড়া দেয় নির্মলা, 'চান করে এসো। খাবে'।

নূপুর বলে, 'তুমি খেয়ে নাও, আমার এখন ক্ষিদে নেই'।

নূপুরের সারা শরীরে অবসাদ। সোফায় শুয়ে থাকে। হাত গুটিয়ে। পা গুটিয়ে। খুব ঠাণ্ডা লাগে নূপুরের। যেন যমুনার মতো সেও হিমঘরে শুয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব ব্যবচ্ছেদ

নির্মলা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি যে বললে তপুকে আসতে বলবে। আসতে বলেছো ?'

নির্মলার মোবাইলটা নূপুরকে দিয়েছে ব্যবহারের জন্য। তপুকে ফোন করার কথা অনেকবার ভেবেছে নূপুর। ভেবেছেই কেবল। ফোন আর করা হয়নি। ঘড়িতে সময় দেখছে নূপুর। তপুর কখন সকাল হবে, কখন দুপুর, কখন ক্লাস, লেকচার, ব্যস্ততা, লাঞ্চ ইত্যাদির হিসেব করে। হয়তো সন্ধ্যের দিকটায় একটু অবসর পাবে। কিন্তু তখন যদি এর কোনও জরুরি মিটিং থাকে। নূপুর চায়না তপুর ভীষণ কোনও ব্যস্ততার মধ্যে একটা উটকো ফোন যাক। নূপুর অত কিছু বোঝে না, তার একটাই প্রশ্ন, কেন তপু আজ যমুনার পাশে থাকবে না ! তপু কি জানে না যমুনা না বাঁচালে তপু বলে কিছু এই জগতে থাকতো না। তপুকে যমুনার জন্য নয়, তপুর জন্যই আসতে বলবে অন্তত একটু হলেও তো মুখখানা দেখতে পাবে ! শেষবারের মতো। আর নূপুরও দেখতে পাবে তপুকে। সেই তপু বেরিয়ে গিয়েছিল দেশ থেকে দেড় বছর বয়সে। সেই সময়ের কথা তপুর কিছু মনে নেই। বাবা কোথায় বাবা কী এসব প্রশ্নও সে কখনও যমুনাকে করেনি যখন বড় হচ্ছিল। বাবা বলে কাউকে কোনোদিন ডাকেওনি। বাবা নামের কোনও পুরুষের জন্য তপুকে কেউ উতলা হতে দেখেনি। যমুনা এমনই ভাবে মহা দুর্যোগের সময়ও বুঝতে দেয়নি দুর্যোগ। যমুনাকে লোকেরা সবাই বলেছে, ও মোটেও সংসারী মেয়ে নয়, দিন রাত বই নিয়ে পড়ে থাকে, স্বামীর সঙ্গে থাকলো না, বাইরের বন্ধু বান্ধব নিয়ে পড়ে থাকে, পুরুষদের সঙ্গে বসে মদ খায়, রাত বিরেতে আড্ডা দেয়, সার্ট প্যান্ট পরে, ছেলেদের মতো চুল, ঠোঁটে লিপস্টিক পরে না, নখে নেলপালিশ দেয় না, চোখে কাজল পরে না, কানে নাকে গলায় হাতে কোনও গয়না পরে না, দেখতে কেমন ছেলে ছেলে, এর দ্বারা বাচ্চা মানুষ করা হবে না। বরং নূপুরকেই বলেছে সবাই, নূপুর শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে, শাড়ি পরে, সাজে, কোমর পর্যন্ত চুল, স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলে, ওর ছেলেকে ও জজ ব্যারিস্টার বানাবে, কেউ একজন বলেছিল, চাঁদে পাঠাবে। হ্যাঁ চাঁদেই গিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বটে, পৃথিবীর সীমানা পার হয়ে অনেক দূরে। নূপুর অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দুএকটা তারা মিটমিট করে জ্বলছে। কে যেন বলেছিল, মরে গেলে মানুষ আকাশের তারা হয়ে যায়।

নির্মলাকে বলে নূপুর, করবে সে ফোন তপুকে।

তপুকে আর কতদিনই বা দেখেছে নূপুর। তপুর বড় হওয়া তার দেখা হয়নি। বরং নির্মলা দেখেছে নূপুরের চেয়ে বেশি। নির্মলার কাছেই নূপুর অনেক গল্প শোনে তপুর। তপু দিল্লির জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পড়তো, কলকাতায় আসতো ছুটিছাটায়। যতদিন থাকতো মা মেয়ে বন্ধুর মতো কথা বলতো, রাতে দু'জন একঘরে ঘুমোতো। প্রায় সারারাতই দুজন গল্প করতো। দু'জনের যে কত কথা ছিল। নির্মলা বলে মাঝে মাঝে মনে হতো ওদের কথা দু'শ বছরেও ফুরোবে না। ইউনিভার্স, গ্যালাক্সি, নতুন নতুন গ্রহের নতুন নতুন চাঁদ, নানারকম থিওরি, এসবের ছাই বোঝে নির্মলা। সে অন্য ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। আবার যখন মেয়েদের সমস্যা নিয়ে, দারিদ্র, নারীপাচার, পতিতাবৃত্তি, ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌন হেনস্থা ইত্যাদি নিয়ে কথা হত, বসে বসে শুনতো।

নির্মলার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন বলে, 'দু'জনে দুনিয়ার এত কিছু কী করে জানতো কে জানে ! দু'জনেই মন দিয়ে দু'জনের কথা শুনতো। মনে হত, একজন আরেকজনের কাছ থেকে শিখছে, দুজনই ছাত্রী, আবার দুজনই শিক্ষিকা। যমুনা তপুর সঙ্গে যত সিরিয়াসলি সব বিষয়ে আলোচনা করতো, অন্য কারও সঙ্গে তত সিরিয়াসলি করতো না।'

এমন সম্পর্ক নির্মলা কোনোদিন কোনও মা আর মেয়ের মধ্যে দেখেনি। হয়তো বাবা আর ছেলের সম্পর্ক এমন হয়। খুব অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে হয়তো আছে, কিন্তু এমন মধ্যবিত্ত সংসারে কমই দেখা যায়। এ দেশে মেয়ে মা'য়ে কথা হলে খাওয়া দাওয়া, শাড়ি কাপড়, কসমেটিক্স, সাজগোজ, কেনাকাটা, সংসার, রান্না বাড়া, স্বামী সন্তান এসব নিয়েই কথা হয়। দুনিয়ার এত কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে হয় না। ওরা দেশি আবার দেশিও নয়।

নির্মলার কথা শুনে নূপুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, —'আসলে কী জানো নির্মলা। আমার কপালটা পোড়া। আমি ভাবতাম দিদির কপাল বুঝি পোড়া। কিন্তু কে জানতো আমিই আসলে হতভাগী। দিদির কষ্ট ছিল। কষ্ট তো ছিলই। আর আমি ভাবতাম আমি বুঝি খুব লাকি, খুব সুখী, কত কিছু বুঝি বলে ভাবতাম। কিন্তু কী বুঝেছি বলো ? একটা ছেলে ছিল। ছেলেটাকে মানুষ করতে পারিনি। মা ছেলেতে তো ওরকম সুন্দর সম্পর্কটা হতে পারতো, পারতো না, বলো ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নূপুরের বাঁ চোখের কোণ বেয়ে একটা জলের ধারা নামে।

— আর কী করতো ওরা ?

— কত কিছু !

— তপু এলে আর কী করতো বুবু ? তোমার যমুনাদি কী করতো ? তুমি কী করতে ?

— একটু বেশিদিনের জন্য হলেই তিনজনই চলে যেতাম পাহাড়ে বেড়াতে। কখনও রিশপ, কখনও ডুয়ার্স, দার্জিলিং, শিমলা, মালানি, লাদাক। পাহাড় যমুনাকে টানতো খুব।

নির্মলার এই শেষ কথাটুকু নিয়ে মনে মনে খেলা করে নূপুর। পাহাড় যমুনাকে টানতো খুব। পাহাড় কি নূপুরকে টানতো না ? কিন্তু নূপুর তো তার সোনার সংসার নিয়ে ছিল। পাহাড়ে কখন যাবে। যমুনা অনেকদিন বলেছে, চলে আয়, আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকবি। পাহাড়ে চল। পাহাড়ে মন ভালো হয়ে যায়।

নূপুর বলতো আমার কি মন খারাপ নাকি, যে মন ভালো করতে কোথাও যেতে হবে। আমি বেশ আছি।

যমুনা চুপ হয়ে যেত।

আজ নিজেকে বড় অসহায় লাগে নূপুরের। তার কোথাও যাওয়া হয়নি। কোনও পাহাড় দেখেনি, কোনো সমুদ্র দেখেনি। অথচ জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এক এক করে প্রিয় মানুষগুলো চলে গেল। চারপাশটা ভীষণ শূন্য। কোথায় গিয়ে আর কী উপভোগ করবে নূপুর ! একা একা কিছু কি ভালো লাগে পাশে একজন ভালো লাগার মানুষ যদি না থাকে ? নূপুর যদি জানতো তার জগতটা হঠাৎ করে একটা ধুধু কবরখানা হয়ে উঠবে, তাহলে হয়তো যা যা করতে ভালো লাগে, যা যা বাকি আছে জীবনে, সেগুলো সে করতো।

— নির্মলা, তোমরা পাহাড়ে কী করতে ? খুব আনন্দ হত বুঝি।

নির্মলা ফুলদানিতে বাগানের তাজা গোলাপ আর তাজা লিলি রাখতে রাখতে বলে— 'আসলে আনন্দ একেক জনের কাছে একেক রকম। আমরা যেভাবে আনন্দ পেতাম, হয়তো অন্য অনেকেই ওভাবে পাবে না। আমাদের আনন্দ তো বারে গিয়ে মত খাওয়ায়, বা ডিসকো নাচায় নয়, আমাদের আনন্দ চুপচাপ বসে পাহাড় দেখায় ছিল। না, কোনও স্পিরিচুয়ালিটির ব্যাপার ছিল না কিন্তু, শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যটা উপভোগ করা। সমুদ্রতেও গেছে যমুনা। শেষবার তো আমি যাইনি, তপুকে নিয়ে কাঠমুণ্ডু গেছিল, ওখান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে গোয়া গেল। তপু কবে আসবে তা জেনেই যমুনা টিকিট করে রাখতো। তপুরও নেশা হয়ে গিয়েছিল বেড়ানোর। এখন মেয়ে ইউরোপ আমেরিকা দেখবে ঘুরে ঘুরে। যমুনার পক্ষে অত তো সম্ভব ছিল না। ফাঁক পেলে ভারতে কোথাও বেড়িয়ে আসা আর বিদেশ বিভুঁই বেড়াতে যাওয়া, দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। তপু তার মার কাছ থেকে বেড়ানো শিখেছে, বেড়াবে। যা শিখেছে মা'র কাছ থেকেই শিখেছে। মাকে বই পড়তে দেখেছে, বই পড়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলতে শুনেছে, ওগুলোয় আগ্রহ বেড়েছে। লেখাপড়া নিয়ে থেকেছে। যমুনার গাইডেন্সে বড় না হলে তপুকে হার্ভার্ড যেতে হত না, নূপুর। ও কলকাতায় কোনও নাপিতের দোকানে চুল কাটতো, নয়তো কোনো অফিসে কোনও ছাপোষা কেরানি হত'।

কিছুক্ষণ থেমে নির্মলা আবার বলে— 'পাহাড় সামনে রেখে তিনজনই আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি। তপু ট্রেক করতে যেত, আমি আর যমুনা ওর জন্য অপেক্ষা করতাম। ওসব ট্রেকিং ফেকিং আমার ভালো লাগতো না। যমুনারও না'।

— 'আর কী কী করতে তোমরা ওই সব পাহাড়ে ?'

— 'ধরো, এক রিশপেই তো যমুনা বেশ কবার গেছে। বলেছিলাম একি তোমার বাপের বাড়ি নাকি যে এত বারবার যাচ্ছো ? যমুনা হাসতো। বলতো অনেকটা বাপের বাড়িই'।

নির্মলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নির্মলার দীর্ঘশ্বাস দেখেই নূপুর বোঝে, নির্মলা জানে বাপের বাড়ি যে যমুনাকে ত্যাজ্য করেছিল, সেই যৌবন থেকেই বাপের বাড়ি যমুনার কিছুই মেনে নেয়নি। হুমায়ুনকে তালাক দেওয়া, পাশার সঙ্গে সম্পর্ক করা, বিয়ে ছাড়া বাচ্চা নেওয়া। কিন্তু বললেই কি কেটে বাদ দেওয়া যায় একটা সম্পর্ক ? যমুনা যত সম্মান আর ভালোবাসা পেয়েছে নিজের জীবনে, তা বাপের বাড়ির ক'টা মানুষ পেয়েছে ! অথচ অপয়া অসতী মুখ দেখানো যায় না, এমন মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকা ভালো, কী লজ্জা কী লজ্জা এসব কথা কম হয়েছে নিজেদের মধ্যে !

যমুনার খবরাখবর নূপুরই দিত বাবা মা'কে। নূপুর তপুর সেবাযত্ন করতে যাচ্ছে, যমুনার বাড়িতে থাকছে, এ বাপের বাড়ির কারও অজান্তে ঘটেনি। যতবারই নূপুর ঢাকায় যেত, এককালের বিদুষী মমতা বানু, নূপুর-যমুনার মা, ছোট বড় কনটেইনারে প্রচুর রান্না করা খাবার দিয়ে দিত। নূপুর এত বেশি খাবার দেখে বলতো, 'এত কেন দিচ্ছ !' মমতা বানু বলতো, 'তোর জন্য দিচ্ছি, পথে ক্ষিধে পেলে খাবি'। নূপুর বুঝতো পথে অত কিলো কিলো খাবার কেউ খেতে পারে না। ট্রেনের কামরায় বসে বক্সগুলোর ঢাকনা খুলে দেখে নিতো কী খাবার দেওয়া হয়েছে। সব যমুনার প্রিয় খাবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের মা বাবা দুজনেই বলতো, 'ওই মেয়ে যেন এই বাড়িতে কোনোদিন পা দেওয়ার চেষ্টা না করে। ওর ছায়াও সহ্য করবো না'। কথায় আর কাজে কী ভীষণ পার্থক্য ! বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার দায় নূপুর যমুনাকেই দেয়। একবারও তো যমুনা বাপের বাড়ি গিয়ে বলেনি, 'ভুল করেছি ক্ষমা করে দাও', অথবা 'যা করেছি বেশ করেছি', যা করেছে কেন করেছে, তা যুক্তি দিয়ে বলতো একবার। একবার বলতো ! কে বলেছে তার মা তাকে আদর করে বুকে টেনে নিত না, বা তার বাবা তাকে কাছে ডেকে আগের মতো গল্প করতো না। যমুনা তার বাবা মাকে এই সুযোগটা দেয়নি। অদ্ভুত একটা অহংকার নিয়ে তিনজনই বসে ছিল যার যার জায়গায়। বাবা মা দুজনেই এক এক করে মারা গেল। যমুনার ঠিক কেমন লেগেছিল খবর শোনার পর, নূপুর আজও জানে না।

— 'নির্মলা, যেদিন বাবা মারা গেল, আমি খবরটা জানালাম। বিশেষ কোনো কথা হল না। শুধু খবরটা জানিয়ে আমি ফোন রেখে দিয়েছিলাম। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। যমুনাদি কী করছিল ? মনে আছে তোমার ?'

নির্মলা বলে যে সেদিন যমুনা তাকে বলেছিল। পরদিন সকালে যখন গান গাইছিল নির্মলা, যমুনা বললো ওই গানটা করো, 'তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি...', পরে গাইতে বললো, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'। চুপচাপ বারান্দায় বসে গান শুনছিল আর চোখের জল মুছছিল। অনেকবার নির্মলা জিজ্ঞেস করেছে, কী হয়েছে তোমার। কিন্তু উত্তর দেয়নি। বিকেলে বলেছে।

নির্মলা দুঃখ-দুঃখ-কণ্ঠে বলে, যমুনার দুঃখগুলো বোঝার উপায় ছিল না।

নূপুর আর জিজ্ঞেস করেনি তার মা মারা যাওয়ার দিন যমুনা কী করেছিল। মা মারা যাওয়ার খবরটা দিতে দিতে নূপুরের সাত দিন দেরি হয়েছিল। সাত দিন পরেই যমুনা জেনেছে তার মা নেই। তপুকে কোনোদিন দেখেনি যমুনার বাবা মা। জয়কে দেখেছে। জয় জন্মানার পর প্রতিবছর নূপুর আসতো দেশে, বাবা মা জয়কে নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছে, এতে তপুকে না দেখার কষ্টও বোধ হয় পরোক্ষে লাঘব হয়েছে। কোনোদিনই তপুর কোনও ছবিও কেউ দেখতে চায়নি।

ফেলে দেওয়া ছুড়ে ফেলা তপু আজ হার্ভার্ডে। নূপুরের কাছে সবকিছু জাদুর মতো মনে হয়। তবে হার্ভার্ডের কারণে মাকে একবার শেষ দেখা দেখতে আসবে না, এ কেমন কথা ! নূপুর মানতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা কলিং বেলের শব্দ শুনে উঠে যায়। সব সময় বাড়িতে যমুনার বন্ধু বান্ধব বা চেনা পরিচিত কেউ না কেউ আসছে। সবাই চোখের জল ফেলে ফেলে দুঃখ করে যাচ্ছে। নূপুরের সঙ্গে দেখা করে, চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, যমুনা কী চমৎকার মানুষ ছিল। দেখে নূপুরের কী যে ভালো লাগে ! কলকাতায় না এলে সে এই দৃশ্য দেখতে পেত না। যমুনার জন্য গর্বে বুক ভরে যায়। এই দৃশ্য যদি তপুও দেখতো ! তপু হয়তো জানে তার মাকে কত মানুষ ভালোবাসে। কত কত মেয়ে আসছে, বলছে যমুনা তাদের কলিগ ছিল, বা বন্ধু ছিল, কেউ বলছে যমুনার সাহায্য ছাড়া বিয়েটা হত না বা ডিভোর্সটা হত না বা চাকরিটা হত না। নানারকম কৃতজ্ঞতা। আবার স্রেফ মিস করা। মানুষ হিসেবে নাকি অসাধারণ ছিল। এমন অসাম্প্রদায়িক, এমন অমায়িক, এমন অসম সাহসী, এমন অসাধারণ, এমন অসম্ভব ব্যক্তিত্ব নাকি তারা খুব কমই দেখেছে। আসলে বাইরের মানুষের চোখ আর ঘরের মানুষের চোখ আলাদা। তারা দু'রকম করে দেখে একজন মানুষকে। ঘরের মানুষের অনেক কিছু চোখে পড়ে না। বাইরের মানুষেরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তবে চোখে পড়ে। যমুনার অনেক গুণ অন্যরা বলার পর লক্ষ্য করেছে নূপুর। তাহলে ঘরের মানুষই বোধহয় বাইরের মানুষ, বাইরের মানুষই ঘরের মানুষ। আসলে যারা ভালোবাসে, যারা বোঝে মানুষটাকে, তারাই সত্যিকারের ঘরের মানুষ।

নির্মলার পেছন পেছন এক যুবক বড় একটা কাগজের বাক্স নিয়ে দোতলায় এল। বাক্স খুলে বড় বড় বাঁধানো ছবি বের করলো। ছবিগুলো যে ভালো বাঁধাই হয়েছে তাও খুলে খুলে দেখালো। নির্মলা তার আগেই ঘর থেকে টাকা আনতে চলে গেল। নূপুরই দেখলো শুধু ছবিগুলো। টাকা পেয়ে যুবক চলে গেল। নূপুর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। নির্মলা বললো, যমুনা দু'সপ্তাহ আগে এই ছবিগুলো বাঁধাতে দিয়েছিল। বাড়িতেই পৌঁছে দেবার কথা ছিল বাঁধাই হয়ে গেলে। ছবিগুলো দেখে নিয়েছে নূপুর, বারোটা ছবিই। বারোটাই তপু আর নূপুরের ছবি। নূপুরের কোলে তপু। নূপুর তপুকে খাওয়াচ্ছে, গোসল করাচ্ছে, তপুকে নিয়ে খেলছে, তপু ঘুমোচ্ছে, পাশে নূপুর। এসব।

নির্মলাও ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলে যে সে জানতো না এই ছবিগুলো যমুনা ছবি-বাঁধাইএর দোকানে দিয়েছে। ফোন করে বাড়িতে আনিয়েছিল বাঁধাইওয়ালাকে। ছবি বড় করা, বাঁধাই করা এসব কাজ যখন করতে দিয়েছে, হয় নির্মলা তখন বাড়িতে ছিল না, থাকলেও দেখেনি কোন ছবিগুলো দিচ্ছে যমুনা।

— সব তোমার আর তপুর ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর কোনও কথা বলে না।

— এই ছবিগুলো আমাকে অনেকবার দেখিয়েছে। নির্মলা বলে।

নূপুর দীর্ঘ সময় নিয়ে স্নান করে। যমুনার ব্যবহার করা তোয়ালে, সাবান শ্যাম্পু চানঘরে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে নূপুর। চারদিকটা কেমন খালি খালি লাগে, মানুষটা ছিল, মানুষটা নেই। মানুষটা হাসতো, হাঁটতো, কথা বলতো, স্নান করতো, মানুষটা হাসবে না, হাঁটবে না, কথা বলবে না, স্নান করবে না। যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

স্নাত স্নিগ্ধ শরীরে নতুন একটা শাড়ি পরে কপালে একটা লাল টিপ পরে নূপুর। সুগন্ধী লাগায় গায়ে। আমেরিকার জীবনে টিপ পরা হয়নি। টিপ পরে সেই আবার পুরোনো জীবনে চলে যায়, যমুনা আর নূপুর দুজনে শাড়ি পরতো, টিপ পরতো, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে হাতে চুরি পরতো, কানে দুল পরতো, গানের অনুষ্ঠানে যেত, নয়ত নাটক দেখতে যেত। ময়মনসিংহে দুজনের একটা আশ্চর্য সুন্দর জীবন ছিল এক সময়।

নূপুরের স্নান করায় নির্মলা খুশি হয়। দুজনে খায় খাবার টেবিলে বসে। মাছ নূপুরের প্রিয়। নির্মলা শুধু ডাল আর শাক দিয়ে খাচ্ছে। মাছ নিচ্ছে না কেন জিজ্ঞেস করলে বললো কটা দিন সে মাছ মাংস খাবে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে কিছু বললো না, মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে গেল, যেন শোনেনি। নূপুর অনুমান করে, যমুনার মারা যাওয়ায় সে নিজের মতো করে কোনও ব্রত করছে। ওই বুজোটাও যেমন। নির্মলা কথায় বলায় চলায় আধুনিক হলেও নিভৃতে একটা কুসংস্কার পোষে। হাতেও দুটো পাথরের আঙটি।

নূপুর ছবিগুলো বিছানায় বিছিয়ে দেয়। নিজেও ছবিগুলোর পাশে শুয়ে দেখতে থাকে। দেখা শেষ হয় না। ঠিক কখন তোলা, কবে, কোন ঘরে, কে তুলেছে এসব এখনও চোখের সামনে ভাসে। যেন এই সেদিনের ঘটনা। অ্যালবামটা নিয়ে এসেছিল যমুনা যখন দেশ ছাড়ে। না নিয়ে এলে এতদিনে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়, ওই ছবি থেকে নূপুর নড়ে না। নির্মলা দু'বার এসে তাড়া দেয়। একবার নির্মলার এক আত্মীয়া এলো, আরেকবার যমুনার অফিসের কেউ একজন এলো, এসব নির্মলাই সামলায়। নূপুর শুয়ে শুয়ে পুরোনো ছবিতে। তার এবার প্রশ্ন জাগে, কেন তপুর সঙ্গে নূপুরের ছবিগুলো যমুনা বাঁধিয়েছে ? তপুর ছোটবেলায় কত মানুষের কোলে তপুর ছবি আছে। তপুর ওই অ্যালবামে যমুনার সঙ্গে তপুর ছবিই বেশি। তবে বারোটা ছবিই কেন বেছে বেছে তপু আর নূপুর ! কেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমুনা আর তপু নয়, বা তপু একা নয় ! এর কোনও উত্তর খুঁজে পায় না নূপুর। নির্মলাকে আর সে জিজ্ঞেস করে না। নির্মলা নির্ঘাত বলবে সে জানে না, যমুনা তাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি।

তপুর তখন সকাল, নূপুর ফোন করে। নূপুর একটাই কথা বারবার করে বলে, 'চলে এসো, নিজের মাকে একবার চলে এসো দেখতে, এ-ই তো শেষ দেখা। আর কখনও চাইলেও তো দেখতে পারবে না। পারলে আজই চলে এসো। মর্গ ফ্রিজারে রাখা হয়েছে, বোধ হয় একটা সময় সীমা আছে। বেশিদিন রাখা সম্ভব নয়। কথা দাও তুমি আসছো'।

তপু ওদিক থেকে বলে, মায়ের মৃত মুখ সে তার মায়ের শেষ স্মৃতি হিসেবে রাখতে চাইছে না।

নূপুর তাকে এসব স্মৃতি ট্রিতির রোমান্টিকতা বাদ দিয়ে রিয়ালিটির সামনে দাড়াতে বলে। রিয়ালিটির সামনে দাঁড়াতে বলাটাই, তপু বলে, এক ধরণের রোমান্টিকতা। তপু জানে তার মা নেই। সে জানে, না থাকাটা মানে কী, কোনোদিন তার মার সঙ্গে কোথাও তার দেখা হবে না। কলকাতায় সে যেতেই পারে, বস্টন থেকে ফ্লাইট দিল্লিতে নয়তো ঢাকায় একটা স্টপ। কারণ মৃত্যু নিয়ে, মৃত্যুর পর ভাসমান আত্মা নিয়ে, মৃত্যুর পর অন্য কোনো জীবন নিয়ে তার কোনও বিশ্বাস নেই, সুতরাং এ ঠিক যমুনাকে দেখতে আসা হবে না, যদি তাকে আসতে বলা হয়, এ আসলে গোপনে গোপনে অনেকটা বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করতে আসা।

— তাহলে আমি, আমি কি বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করতে এসেছি তপু ? আমি কি ওসব আত্মা টাত্মায় বিশ্বাস করি !

— 'তুমি যদি না করো, তাহলে তো ভালই। একজন কেউ আত্মীয় ওরা চাইছিল নূপু-খালা। দেখওনি তো অনেক বছর নিজের দিদিকে। শেষ দেখাটা তুমিই দেখ'।

তপু দ্রুত ফোন রেখে দেয়। ওর বাংলা উচ্চারণ অদ্ভুত। না ঢাকার, না কলকাতার।

জগতে একজন মানুষের সঙ্গেই ছিল তপুর বন্ধন। সেই বন্ধন তার নেই এখন। বাইরের জগতকেই নিজের করে নিতে হবে। যমুনার না থাকা তপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য ঠিক কী, তা ভেবে নূপুরের বুকে ব্যাথা শুরু হয়। মুখ মাথা ঢেকে শুয়ে পড়ে নূপুর। নির্মলা লক্ষ্য করে নূপুর ভালো বোধ করছে না। পাশে শুয়ে চুলে মিনিট কুড়ি হাত বুলিয়ে নিঃশব্দে উঠে যায়। নির্মলা অনেকটা এ বাড়িতে মায়ের মত। হয়তো এভাবেই সে যত্ন করতো যমুনার।

নূপুর একটা এসএমএস করে দেয় তপুকে, তুমি বললে আমি তোমার জন্য ফ্লাইট টিকিট বুক করতে পারি। কখনও তো তোমাকে কিছু দিইনি, আজ এই গিফ্টটা দিতে চাইছি।

এসএমএসএর উত্তর আসে। ইউ আর সো সুইট নূপুখালা। হোয়াই ডিডন্ট আই স্পেন্ড মোর টাইমস উইথ ইউ ! আই ফিল সাফোকেটেড। মাই মা ইজ নো মোর। ইটস লাইক আই অ্যাম নো মোর। ইফ আই গো দেয়ার, আই উইল ডু অনলি টু মীট আপ ইউথ ইউ।

কতবার যে পড়ে তপুর এই ওইটুকু লেখা।

যমুনার শরীরটা এখনও আস্ত আছে, কাঁটাছেঁড়া হওয়ার আগে একবার দেখুক মেয়ে। যে মেয়েটার জন্ম হয়েছে যমুনা তাকে জন্ম দিয়েছিল বলে। যে মেয়েটা বেঁচে আছে যমুনা তাকে বাঁচিয়েছিল বলে। এই মেয়েটার বেঁচে থাকার জন্য একটা দানবকে হত্যা করতে হয়েছে, একটা দেশ হারাতে হয়েছে, সমাজ সংসার, আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন সবকিছু হারাতে হয়েছে যমুনাকে। এই মেয়ে দেখুক আরেকবার সেই প্রাণদাত্রীকে, প্রাণভরে দেখুক, শেষবার।

'পিসহেভেনে অনেক টাকা যাচ্ছে। আর কতদিন রাখবে এভাবে ?' নির্মলা প্রশ্ন করে।

নূপুর বলে, 'এত অশান্ত হওয়ার কী আছে। ব্রজকে বলে দিও। আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে'।

নির্মলা বলে, — 'ক'টা দিন ? এক দিনের টাকা কিন্তু কম নয়'।

— সে যাক। টাকার কথা চিন্তা করো না। টাকা আমি দেব।

— সে দাও তোমার টাকা কি টাকা নয় ? কষ্ট করে রোজগার করোনি ?

একটু থেমে নির্মলা অদ্ভুত চোখে চারদিকে তাকায়। মিহি সুরে বলতে থাকে, — 'এভাবে হিমঘরে একটা মানুষ কী করে পড়ে থাকবে। যমুনাদি অত ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারতো না। একটু ঠাণ্ডা পড়লেই লেপ কম্বল জড়ো করতো। একবার দিল্লি গিয়েছিল শীতের সময়। ঠাণ্ডায় নাকি জমে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো অবস্থা। এসে তো গল্প করলো তীরের মতো নাকি ফুটছিল গায়ে। আর এই হিমঘরে কী করে পড়ে আছে কে জানে !'

নূপুর ভেবেছিল হিমঘর নিয়ে নির্মলা রসিকতা করছে। কিন্তু দেখে নির্মলার চোখে জল। নির্মলা সত্যিই এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছে যে যমুনা ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে আছে। কাঁথা নেই, কম্বল নেই। লেপ নেই, তোশক নেই। বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে এসব, সেও মানবে না ওরা। নির্মলা এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদা ব্যাপারটা হয়তো সংক্রামক। নূপুরও চোখেও জল।

পরাবাস্তব একটা দৃশ্য।

দৃশ্যটা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে।

সব স্থিরতা ভেঙে নূপুর বলে, 'তপু আসছে নির্মলা। ও শুধু একবার ওর মাকে দেখতে আসছে। এই তো শেষবার। আর তো দেখা হবে না। আর তো ওরা দুজন বন্ধুর মতো রাত জেগে গল্প করবে না। আর তো পাহাড়ে বেড়াতে যাবে না। এই তো শেষ'।

জয়এর মৃত্যুর পর যমুনার মৃত্যু নূপুরের কাছে এক বীভৎসতা ছাড়া কিছু নয়। জয় ছিল প্রাণের ধন। যমুনা ছিল তার সোনের আদর, তার মায়ের কোল, দুঃসময় এলে সেই কোলে এসে মাথাটা রাখবে, যমুনাই সব দুঃসময় এক ফুঁয়ে বিদেয় করে জাদুবলে সুসময় নিয়ে আসবে। যমুনা কী ছিল না নূপুরের !

নূপুর ভাবতে থাকে যে নূপুর বাঁচিয়েছে যমুনা আর তার মেয়েকে দেশ থেকে তড়িঘড়ি বের করে দিয়ে। পাশার লোকেরা হয়তো প্রাণে বাঁচতে দিত না দুজনের কাউকেই। অথবা খুনের দায়ে ফাঁসাতো যমুনাকে। ঘাঁটাঘাটি করবে না পাশার প্রেমিকা নিয়ে, এরকম ভেবেছিল, কিন্তু যদি মত পাল্টাতো ! যমুনা নূপুরের উপদেশ শুনেছিল। কিন্তু নূপুর যদি যমুনার উপদেশ শুনতো, যদি টেনে হিঁচড়ে জয়কে রিহ্যাবে রেখে আসতো, বাঁচতো জয়, নতুন জীবন পেতো। অন্যরকম হতো নূপুরের জীবন। জয় মারা যাওয়ার পর যমুনার সঙ্গে নূপুরের কথা হয়েছে ফোনে, চিঠিতে, কিন্তু দেখা হয়নি। সেই যে নিজেকে জগতের সবকিছু থেকে সরিয়ে একা করে ফেলেছিল নূপুর, কাউকে তার দেয়ালে টোকা দিতে দেয়নি, যমুনাকে দিয়েছে, তবে খুব কমই দিয়েছে। মনে মনে ক্ষমা চায় সে যমুনার কাছে। যমুনা বেঁচে থাকতে নূপুর একবারও ক্ষমা চায়নি। যা নয় তা বলে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া সব সহ্য করেছে যমুনা তারপরও রাগ করেনি নূপুরের ওপর। যমুনার জায়গায় হলে, নূপুর অনুমান করে, জন্মের মতো সম্পর্ক সব সে ঘুচিয়ে দিত। কী দিয়ে গড়া ছিল যমুনা !

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা, কী দিয়ে গড়া ছিল তোমার যমুনাদি ? মনে মনে বলে সে। নির্মলাকে আর জিজ্ঞেস করা হয় না।

তপু আসবে এই খবরটুকু নূপুরকে সুখ দিতে থাকে। জয় মারা যাওয়ার পর এই প্রথম তার মনে কোনও কিছুর জন্য সুখ হচ্ছে। তপু আসছে, নূপুরের মনে হচ্ছে যেন জয় আসছে। যেন জয় হার্ভার্ডে পড়তে গেছে, যেন নূপুর আজ মারা গেছে, খবর পেয়ে জয় আসছে নূপুরকে দেখতে, শেষকৃত্য করতে। যমুনা নয়, হিমঘরে শুয়ে আছে নূপুর, জয় মরেনি, জয় আসছে। আর নূপুর যমুনা। জয়কে তুলতে সে বিমানবন্দরে যাবে, কত কাল পর জয়কে দেখবে যমুনা ! বুকে জড়িয়ে আদর করবে। খালার আদর আর মায়ের আদরে পার্থক্য আছে নাকি ?

নূপুর নিজের মৌনতা আর মগ্নতা ভেঙে জিজ্ঞেস করে, মা আর মাসিতে তফাৎ কিছু আছে কি, নির্মলা ?

— তফাৎ তো আছেই। মাসি মাসি। মা মা।

— সে তো জানি। কিন্তু আদরে ?

নির্মলা দুজনের জন্য চা করে আনে। যমুনার ভীষণ চা খাওয়ার অভ্যেস ছিল। নির্মলার তাই ঘন ঘন চা বানানোর অভ্যেস হয়ে গেছে। দার্জিলিং থেকে কিলো কিলো চা আসতো। যমুনার এক বন্ধু পাঠাতো। নূপুর যে যমুনা নয়, নূপুরের যে যমুনার মতো দিনে তিরিশ কাপ চা খাওয়ার অভ্যেস নেই, তা নির্মলা জানে না। একটা কাপ নূপুরের হাতে দিয়ে চেয়ারে বসে খাটে পা দু'টো তুলে দিয়ে নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নির্মলা বলে, 'মায়ের তো কেউ হয় না নূপুর। মা মা-ই। চেষ্টা করলে কেউ কাকা হতে পারে, মামা হতে পারে, ভাই হতে পারে, বোন হতে পারে, চেষ্টা করলে হয়তো বাবাও হতে পারে, কিন্তু হাজারো চেষ্টা করেও মা হওয়া যায় না'।

নূপুর চুপসে যায়। একবার ভাবে জিজ্ঞেস করবে, কবে এমন বিশেষজ্ঞ হলে মা নিয়ে ? নিজে তো বিয়েও করেনি। বাচ্চা কাচ্চাও নেই তোমার ! কোনও বাচ্চাকে বড়ও করোনি।

না, তপুর মা হওয়ার চেষ্টা নূপুর করছে না। তপুর সঙ্গে দেখাই বা হয়েছে ক'দিন নূপুরের ! তপু কেমন দেখতে এখন, কী রকম ওর জীবন যাপন, কী খেতে পছন্দ করে, কী করতে, কী পড়তে, কী পরতে, তা নূপুরের চেয়েও বেশি জানে নির্মলা, যে নির্মলার সঙ্গে তপুর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা আবার একটা পরাবাস্তব দৃশ্য রচনা করে, মিহি স্বরে আবার বলতে থাকে, — 'একটা মানুষ হিমঘরে শুয়ে আছে, শুয়ে থাকার একটা সীমা আছে। তপু একবার দেখে যাক, তারপর আর দেরি করো না'।

নূপুর ম্লান হেসে বলে,— 'নির্মলা, যতক্ষণ বুবু হিমঘরে আছে, একটা সান্ত্বনা আছে। মানুষটা আছে, যখন ইচ্ছে ওর নাক চোখ মুখ, ওর হাত পা, ওর আঙুলগুলো, সেই আঙুলগুলো দেখতে পাবো, ওখান থেকে চলে গেলেই তো সব শেষ। কিছু তো আর দিদির আস্ত থাকবে না'।

নির্মলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, — তা থাকবে না। আসলে আমাদের মধ্যে এই এতদিন রাখার চলটা নেই। তোমাদের মধ্যে দেখেছি ব্যাপারটা চলে, অনেকদিন রেখে দাও।

এবার আগুনে খড়কুটোর ঝুড়ি উপুড় করে ঢেলে দিল কেউ। নূপুর হঠাৎ উঠে গিয়ে বাইরে রাখা তার কাপড় তার হাতব্যাগ তার চিরুনি তার ময়শ্চারাইজার জড়ো করে সুটকেসে ঢোকাতে থাকে আর বলতে থাকে,— তোমাকে এর আগেও শুনেছি আমাদের মধ্যে আর তোমাদের মধ্যে বলে কথা বলো তুমি। আমাদের তোমাদের মানেটা কী শুনি। তুমি যমুনাদির সঙ্গে এতবছর থেকেও আমাদের তোমাদের শব্দগুলো বাদ দাওনি ! এখনও তোমার মধ্যে এই হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করার অভ্যেস ? যমুনাদি কী করে আপাদমস্তক নাস্তিক হয়ে তোমার মতো আস্তিক নিয়ে ঘর করতো কে জানে। যমুনাদির কিছু জিনিস আজও আমি বুঝিনা। তুমি খুব অ্যাডোরেবল, খুব ভালো মানুষ, খুব দয়ার সাগর, গুণবতী রূপবতী সবই তুমি। কিন্তু যমুনার সঙ্গে মিলতো কোথায় তোমার ? সে বিজ্ঞানী, সোজা কথার লোক, হাবিজাবি ধর্ম আর ফালতু কুসংস্কারকে সহ্যই করতে পারতো না, আর দিব্যি কি না..'

নির্মলা স্তব্ধ হয়ে যায় নূপুরের এই চিৎকারে।

— 'আমার নিজের বোন। ওকে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালো চিনি। হাড়ে হাড়ে চিনি। তোমার মতো পুজো করা মানুষের সঙ্গে যমুনাকে মেলাতে পারি না। কী নিয়ে কথা বলতে তোমরা ? টপিক কী শুনি ? রান্নাবান্না নাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'।

নূপুর থামতে চাইছে না।

— 'আমার দিদি সারাজীবন অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছে। একটা দেড় বছরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এসে একটা ভিন দেশে একা একা ক'দিনেই কেমন দাঁড়িয়ে গেল। ভালো চাকরিও পেয়ে গেল। বাচ্চাকে ভালো ইস্কুলে পড়ানো, বাচ্চাকে শিক্ষিত করা, মানুষ করা, কী না করেছে ? দিদির জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি হলে রাস্তায় হোমলেস হয়ে আমার বাকি জীবন কাটাতে হত। ভিক্ষে করতে হত। বাচ্চাটাকেও বাঁচাতে পারতাম না। দিদির মতো ক'জন পারবে ? চ্যালেঞ্জ করেছে এ দেশে টিকে থাকবে, এ দেশে টিকে ছিল। ভালোভাবেই টিকে ছিল। কলকাতায় ক'টা উইমেনস অরগানাইজেশন ছিল, বলোতো ! সম্ভবত অত বড় একটা সংগঠান দিদিই প্রথম করেছে। পাঁচ হাজার সদস্য, চাট্টিখানি কথা ? একটা আপাদমস্তক সাকসেসফুল পারসন। তুমি কেন যমুনাদির সঙ্গে, তুমি কে ? লেখাপড়া কতটা করেছো ? কলেজ পাশ করেছো, বোঝো যমুনার কিছু, নির্মলা ? তোমার কাজটা কী, বলো ? সত্যি কথাটা বলো, বলো, লেসবিয়ান ছিল যমুনাদি, বলো। মরেই তো গেছে, এখন লুকোনার কী আছে ? বেঁচে থাকতেই তো ও কিছুই লুকোয়নি'।

নূপুর বলতে বলতে চোখের জল মুছতে থাকে। নির্মলা নিঃশব্দে উঠে যায়, বারান্দায় উদাস দাঁড়িয়ে থাকে।

নূপুর শুয়ে থাকে। যমুনার বিছানার পাশের টেবিলে অনেকগুলো বই আর ম্যাগাজিন উঁচু করে রাখা। শেষের দিনগুলোতে এগুলোই হয়তো পড়ছিল, নূপুর ওগুলোই নাড়ে চাড়ে, পড়ে, বাঁধানো ছবিগুলো দেখে।

নির্মলা কোথাও বেরোয়। নূপুরকে বলে বেরোয় না। দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে টের পায় নূপুর। নির্মলা আবার একেবারে চলে যাচ্ছে না তো ! খুব অপমান বোধ করেছে। নির্মলার জায়গায় নূপুর হলেও হয়তো একই জিনিস করতো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। নূপুর ঠিক বুঝতে পারে না সে এমন ব্যবহার নির্মলার সঙ্গে করলো কেন। ঈর্ষা নাকি অন্য কিছু ? নির্মলার ওই আমার-তোমার বলে কথা আর সহ্য করতে পারছিল না নূপুর। রাগটা বেরিয়ে এলো, থাকিস দিদির বাড়িতে, খাস দিদির পয়সায়, যে মানুষটা তোকে ভালোবেসে তোর ধর্ম কর্ম নিয়ে আপত্তি করেনি, আর তুই কি না আমাদের মধ্যে- তোমাদের মধ্যে বলে তার সঙ্গে কথা বলেছিস। নিশ্চয়ই দিদির সঙ্গে ওভাবেই কথা বলেছিস। বলেছিস বলেই আজ আমার সঙ্গে মুখ ফসকে তোর ওসব বেরোয়। তুই এখনও ভাবিস যমুনার চেয়ে তুই আলাদা। আমি আর তুই আলাদা। তোর মানুষ পরিচয়টার চেয়ে তোর হিন্দু পরিচয়টাই যদি বড় হয়, তবে যা না হিন্দুদের মধ্যে গিয়ে থাক। যমুনাকে মুসলমান বলে ট্রিট করেছিস, আর এতকাল যমুনা তোর ইডিয়টিক ব্যবহার সহ্য করে গেছে। কোনোদিন দেখেছিস যমুনাকে নামাজ পড়তে, রোজা করতে, বোরখা পরতে ? তোর পুজোটা তো ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছিস। কেউ কেউ ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আবার কেউ কেউ ধর্ম থেকে মুক্ত করে নেয় নিজেকে। অনুগ্রহ করে তাদের গায়ে আর হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদির লেবেল লাগাস না। নূপুরের ভেতরের এক রাগী নূপুর নির্মলাকে ওভাবেই নিঃশব্দে গালাগালি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমুনা নেই অথচ যমুনার সংসার একটুও হেলে পড়েনি। নির্মলা নিপুণ হাতে সব সামলাচ্ছে। প্রচুর বাজার করে ঘরে ফেরে নির্মলা। তপু আসবে বলেই হয়তো মাছ মাংস প্রচুর কিনেছে। নূপুর দূর থেকে দেখে তার দিদি আর তার দিদির বান্ধবীর সংসার। কার বেশি অধিকার এ বাড়িতে ? নূপুরের না নির্মলার !

বিমান বন্দরে তপুকে নূপুর চেনার আগেই চিনেছে নির্মলা। নূপুর পেছনে দাড়িয়ে ছিল। তপু নির্মলাকে প্রথম জড়িয়ে ধরে দু'গালে চুমু খেল, নূপুরকেও তাই করলো। নূপুরকে যখন তপু জড়িয়ে ধরেছে বলতে বলতে 'ও নূপুখালা, কতদিন পর দেখা হল তোমার সঙ্গে'। নূপুরের চোখ বেয়ে অঝোরে ঝরছে জল। তপুর পরণে সাদা একটা সার্ট, আর নীল জিনস। যমুনার মতোই ছোট চুল। দেখতে নাকি পাশার মতো তপু। আজ নূপুরের মনে হয়, দেখতে তপু অবিকল যমুনার মতো। সেই চোখ, সেই ঠোঁট। তপুর এখন যে বয়স, সে বয়স যখন যমুনার, নূপুর তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। এখনকার তপুর বয়সী তখনকার যমুনাকে। কত কিছু কাণ্ড করে ফেলতো তখন যমুনা। কী ভীষণ সাহসী আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির মেয়ে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করলো। সবাই তার লেখাপড়ায় ভালো করা, ভালো চাকরি পাওয়া নিয়ে বলতো, 'যমুনা তো মেয়ে নয়, যেন ছেলে' ! যমুনা এমন মন্তব্য শুনতে মোটেই পছন্দ করতো না। সংসারে যমুনাই একমাত্র, যাকে নিয়ে গর্ব করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহস দেখাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখছে সবাই, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে যেই না যমুনা সাহসের পরিচয় দিল, অমনি ওই সাহসটাকে আর কারও পছন্দ হল না। যমুনা একা হয়ে গেল। একাই সামলালো সব নিন্দা, সব অপমান। এক নূপুরই ছায়ার মতো ছিল পাশে। যমুনার অসম্ভব ভালোবাসা পেয়েছে নূপুর, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই হয়তো দিতে পারেনি। কিছুই কি দেয়নি ? দিয়েছে। ভালোবাসা দিয়েছে নূপুর, কিন্তু কোথাও কৃপণতা ছিল। নূপুর বোঝে, যে, ছিল।

নূপুরের একটা হাত তপু ধরেই রাখে। নূপুরের মনে হয় হাতটা তপু যমুনাকে ধরেছে। ঠিক এভাবেই হয়তো ধরে রাখতো নিজের মায়ের হাত যখন দেখা হত।

— 'তোমার মনে আছে ঢাকার কথা, শান্তিবাগের বাড়িতে তোমার মা অফিসে চলে যেত, তুমি আমার কাছে থাকতে, কত গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে ঘুম পাড়াতাম, খাওয়াতাম' ! নূপুর মিষ্টি হেসে বলার পর তপু হেসে বলেছে, — 'মা সব বলেছে। আমার তো সেই দিনগুলোর কথা মনে নেই। কত ছোট ছিলাম, তাই না' !

— 'হ্যাঁ খুব ছোট ছিলে। তোমাকে দেখার তো কেউ ছিল না, তাই আমিই ছিলাম। তোমার মাকে খুব ভালোবাসতাম তো। চাইল্ড কেয়ার তোমাকে দিয়ে শুরু। আমি তো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সে কারণে জয়এর সময় কোনও অসুবিধে হয়নি। জয়কে মনে আছে তোমার ?'

তপু জোরে হেসে ওঠে। বলে—'মনে থাকবে না কেন ? আমরা এক সঙ্গে সাইকেল চালিয়েছিলাম নিউইয়র্কের রাস্তায়। ও খুব ফাস্ট চালাতে পারতো। জয় এখন কী পড়ছে ? ও ট্রাই করলে হার্ভার্ডে পড়তে পারে কিন্তু। আমি হেল্প করতে পারি, যদি ও চায়। ওর ফেইস বুকে আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম, অ্যাকসেপ্ট করেনি'।

নূপুর চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ কথা বলে না। জয় মারা গেছে এই খবরটা যমুনা কেন দেয়নি তপুকে ? কী কারণ ছিল এর পেছনে, সে যমুনাই জানে। যা জানায়নি যমুনা, তা আর যেচে জানাতে চায় না নূপুর। তার চেয়ে না জানাই থাকুক। একটা মৃত্যুর শোকই করুক দু'দুটোর প্রয়োজন নেই।

বাড়ি এসে নূপুর অস্থির হয়ে পড়ে তপুকে কী খাওয়াবে, কোথায় বসাবে, কোথায় শোওয়াবে। পারলে নূপুর যেই ছোটবেলার মতো গা মেজে স্নান করিয়ে দেয়। নূপুর এক মুহূর্ত কাছ ছাড়তে চায় না তপুর। বাড়িতে তপুর এঘর ওঘর হাঁটা, বাগানে ফুলগাছগুলোয় জল দেওয়া, গান গাইতে গাইতে স্নান ঘরে ঢোকা— দেখে নূপুরের খেয়াল হয় এ বাড়ি যমুনার শুধু নয়, এ বাড়ি তপুরও। তপুর নিজের ঘরটিতেই প্রচুর কাপড়-চোপড়। সুটকেসে পরার কাপড় কিছু আনেনি, এনেছে পড়ার কিছু বই, নির্মলা আর নূপুরের জন্য কিছু উপহার, কিছু ছোট-খাটো এটা-সেটা। রান্না-বান্নার কাজ করছিল নির্মলাই। এবার নূপুর ঢোকে। তপুর জন্য সে স্পেশাল খাবার তৈরি করবে। নির্মলা বলে তপু বাঙালি খাবারই পছন্দ করে। তপু রান্না ঘরে ঢুকে বলে, 'আজ কোনও রান্না করতে হবে না, চল রেস্টুরেন্টে খাবো। আসলে এ বাড়িতে মা নেই, এটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতে হবে একটু দম নেওয়ার জন্য'।

কলকাতা শহর ভালো চেনে তপু। তপুই নিয়ে গেল নির্মলা আর নূপুরকে রেস্টুরেন্টে। গড়িয়াহাটের ভজহরি মান্নায়।

তপু যতক্ষণ আছে, নূপুরের সঙ্গেই সময়টা কাটাতে চাইছে। সঙ্গে ল্যাপটপ আছে, তবে ও নিয়ে একেবারে বসছেই না, খুব প্রয়োজন না হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রটা সে খুলবেই না। সে এসেইছে নূপুরের জন্য। রাতে তপু নূপুরের সঙ্গে শুলো। খাটের যে পাশটায় তপু শুতো, সে পাশটায়। আর যে পাশটায় যমুনা শুতো, সে পাশটায় আজ নূপুর। দু'জনে গল্প করলো অনেক রাত অবদি। প্রায় সকাল হলে ঘুমোলো। নূপুর একটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে রাখলো তপুকে। যেন এই তপুই আজ যমুনা, আর একই সঙ্গে এই তপুই জয়।

পরদিন নূপুর আর নির্মলা তৈরি হয়ে তপুকে ডাকছে, চল যমুনাকে দেখবে। তপু সোজা জানিয়ে দিল, সে দেখবে না। ওই ইচ্ছে তার একেবারেই নেই। তপু উপুড় হয়ে শুয়ে রইলো, কারওরই আদুরে গলার উপদেশে বা কড়া আদেশে কোনও নড়চড় হল না। একেই বলে জেদ, যমুনারও এরকম ছিল, যেটা করবে, সেটা করবেই। নূপুর বলে, এত দূর থেকে এতগুলো টাকা খরচ করে এলে নিজের মা'কে শেষ বার দেখবে, আর তুমি কি না আসার পর বলছো দেখবে না, কী লাভ হল তাহলে এসে ?

— আমি একবারও বলিনি আমি মাকে দেখবো। আমি বলেছি যদি যাই তোমার জন্যই যাবো।

— সে বলেছো। কিন্তু এখন যেহেতু এসে গেছো, এখন মা'র মুখখানা একবার দেখ।

তপু মাথা নেড়ে বলে, 'না, আমি সেই মাকে দেখতে চাই না যে মা আমাকে আদর করবে না, আমাকে চুমু খাবে না, আমার সঙ্গে কথা বলবে না, আমার দিকে তাকাবে না, সে মা নয়। এ শুধু মা'র শরীর। আমি দেখবো না'।

— 'তাহলে আসার কী দরকার ছিল এতদূর। আটলান্টিক পার হয়ে ?'

নূপুরের রাগ হয়। নূপুর চেঁচায়।

— 'তোমাকে দেখতে এলাম। এ ছাড়া আর কি কোনও সুযোগ হত নিজের মাসিকে দেখার ?'

তপুকে কিছুতেই ওঠাতে পারলো না দুজন। নির্মলা বললো যেন তপু নূপুরের জন্যই যমুনাকে দেখতে যায়, নূপুর এত আশা করেছিল। না নূপুরের জন্যও সে এ কাজ করবে না।

নির্মলা আর নূপুরই গেল হিমঘরে, তপু ঘরে রইলো। আজই ব্রজকে তাহলে বলে দিতে হবে বডি নিয়ে যেতে। আর সময় নষ্ট করা যায় না। ব্রজকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। পথে যেতে যেতে জরুরি এসএমএস করা হল কয়েকবার। 'খুব জরুরি, ফোন করো। আজ বিকেলে লাশ নিয়ে যেতে পারো। কী করবে জানিও'। তিনটে এসএমএসের উত্তর আসেনি তিন ঘণ্টায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা উদ্বিগ্ন। যমুনার শীতল শরীর আরো একবার দেখা হল নূপুরের। যমুনার বরফ-ঠাণ্ডা গায়ে নির্মলা সিঁদুর লাগিয়ে এলো একগাদা। সেই যে শুরু হয়েছে নির্মলার সাদা শাড়ি পরা, এখনও তাই পরছে। নির্মলাকে ওরকম অপমানজনক কথা বলার পর নূপুর নয়, নির্মলাই এগিয়ে এসে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে। নির্মলাই নূপুরকে গান শুনিয়েছে, খাবার তৈরি করে এনেছে, চা দিয়েছে।

তপু কথায় কথায় বলে নির্মলার সঙ্গে একমাত্র যমুনাকে সে দেখেছে সুখী। আর কোথাও কারও সঙ্গে, বিশেষ করে কোনও পুরুষের সঙ্গে যমুনা খুব সুখী ছিল না। অবশ্য ক'জনের সঙ্গেই বা সে দেখেছে যমুনাকে। নিজের বাবার কথা মনে আছে ? তপু ঠোঁট উল্টে বলে, না। পাশা দেখতে কেমন ছিল, সেও তপু জানে না। তাকে কেউ পাশার কোনো ছবিও দেখায়নি। দেখার নাকি তার কোনও ইচ্ছে নেই। নূপুরের খুব জানতে ইচ্ছে করে, যমুনা যখন নিজের জীবনের সব কথাই সব ঘটনাই জানিয়েছে তপুকে, তখন পাশাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও কি জানিয়েছে। নূপুর কী করে জিজ্ঞেস করবে ঠিক বুঝতে পারে না। অনেকক্ষণ সে ভাবায় প্রশ্নটা, 'তোমার বাবার কথা কিছু জানো ? উনি তো মারা গেছেন অনেক আগে। তুমি তখন ছোট। কী করে মারা গেছেন, জানো ?' 'বুবু কি তোমাকে তোমার বাবার কথা কিছু বলেছেন ? কী করে ওর মৃত্যু হল বলেছেন ?' 'তোমার বাবা মানে পাশা ভাইকে তো বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল, জানো কেন মারা হয়েছিল, কে মেরেছিল ?' 'তপু, তুমি বড় হয়েছো, অনেক বোঝো, তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার মা জীবনের কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন, কিছু জানো ?' 'তুমি যে বেঁচে আছো আজ, সে তোমার মা একটা বড় রকম ক্রাইম করেছিলেন বলে। কেউ কেউ এটাকে ক্রাইম বলবে, কেউ কেউ বলবে না। এ অনেকটা আইন নিজের হাতে নেওয়া। বিপ্লবীরা তো নেন, আমরা তাঁদের সম্মান করি। তুমি যেন তোমার মা'কে কখনো ভুল বুঝো না'। 'বুবু যদি ওই ঘটনাটা না ঘটাতো, তোমাকে আমরা পেতাম না। বুবু তোমার বাবাকে বিষ খাইয়েছিল। কারণ তোমার বাবা তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ঘরের কাজের লোককে টাকা দিয়ে কাজটা করাতে চেয়েছিল। হয়নি। তাই নিজেই মারার প্ল্যান করেছিল। তোমাকে হিট করেছিল। পাশাকে না সরালে সে তোমাকে মেরে ফেলতোই। আজ তোমাকে আমি বললাম এই ঘটনার কথা, পরে যেন কখনো জানতে পেরে বুবুকে খুনী বলে ভেবোনা'।

নূপুর যখন খাবার টেবিলে বসে বসে চা খেতে খেতে আপন মনে ভেবে চলেছে কী করে প্রশ্নটা সাজাবে, তপু পেছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে মাথায় আর ঘাড়ে নাক ঘসতে ঘসতে বলে, 'তোমার শরীরের ঘ্রাণটা একবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের শরীরের ঘ্রাণের মতো। তোমাদের মা'য়ের উইটেরাস থেকেই তোমরা এই স্মেল নিয়ে জন্মেছো'। তপু হাসতে থাকে।

তপু কোনওদিন তার নানা নানিকে দেখেনি। বেঁচে ছিল তাঁরা, একই শহরে ছিল, কিন্তু দেখা হয়নি। নূপুর এক হাতে তপুকে টেনে পাশে বসায়। 'নানি কেমন ছিল, তোমার নানা কেমন ছিল, ছবি দেখেছো ?

বুবু দেখিয়েছে ছবি আমাদের বাবা মা'র ?'

তপু হেসে মাথা নাড়ে, না।

কী রকম মনে হয়, দেখতে কেমন ছিল। মানুষ কেমন ছিল ?

তপু বলে, আমি কল্পনা করে নিই। আমার কল্পনায় ওঁরা খুব চমৎকার মানুষ। আমার সঙ্গে দেখা হলে ওঁরা হয়তো খুব ভালোবাসতেন আমাকে। মা'র ওপর ওঁদের রাগ ছিল, মা বলেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে কী আর রাগ পুষে রাখতে পারতো, সব জল হয়ে যেত। আমার এরকমই বিশ্বাস। আমার মা'র মতো মানুষকে যাঁরা জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা কি খুব ইর‍্যাশনাল হতে পারেন নাকি, খুব নিষ্ঠুর কী ? আমার কিন্তু মনে হয় না ? বলো কেমন ছিলেন ওঁরা ? খুব রাগী ?

নূপুর মাথা নাড়ে, না।

ইগো প্রবলেম ? তপু জিজ্ঞেস করে।

নূপুর বলে, হ্যাঁ তাই।

— জয় দেখেছে নানা নানিকে ?

— দেখেছে। জয়কে ওরা ভালোবাসতো দুজনই। ভীষণ ভালোবাসতো। যতবারই এসেছে দেশে, বাবা মা ঢাকা এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসতো। তোমার আদর যা পাওনা ছিল, তা জয়ই পেয়েছে। জয়কে ওরা অতিরিক্ত দিয়েছে, তোমাকে দিতে পারেনি বলেই হয়তো বেশি করে দিয়েছে। তোমার একটা ছোটবেলার ছবি দিয়েছিলাম ওঁদের। বলিনি তোমার, কিন্তু বুঝেছিল যে তোমার। আমার বাবা তোমার সেই ছবি বাঁধিয়ে রেখেছিল নিজের বেডরুমে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো, কার ছবি। বাবা বলতো, যমুনার ছোটবেলার ছবি'।

তপুর চোখ চিকচিক করে বিন্দু বিন্দু জলে। — চল বারান্দায় গিয়ে বসি, নির্মলা মাসি গান গাইবে। কতদিন গান শুনিনা।

নির্মলা গান গায়, তপুকে প্রায় কোলে বসিয়ে। নূপুর খানিকটা দূর থেকে তপু আর নির্মলার আন্তরিক সম্পর্কটা দেখে। যমুনা আর নির্মলার সম্পর্কের কথা তপু কতটুকু জানে, কী জানে, তপু জানে না। যদিও নূপুর তপুকে কোনো প্রশ্ন করেনি তার বাবার মৃত্যু নিয়ে, নূপুরের বিশ্বাস হয় তপু সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাও জানে। একটা টিশার্ট আর শর্টস পরে আছে তপু। যেন একটা বাচ্চা ছেলে। আদুরে আদুরে গলা। যমুনার জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে না, কিন্তু যেন যমুনার জন্য যারা কাঁদছে, সেই মানুষগুলোর চোখের জল মুছিয়ে দিতে ও এসেছে। যেন যমুনাই এসেছে অল্প বয়সী মেয়ের রূপে, যেন যমুনাই। জীবনের দিকে তাকাতে বলছে, সামনের দিকে। আমরা সবাই যাবো। তুমিও, আমিও। ধরো যমুনা আছে, ওর যা ভালো লাগবে, চল সবাই মিলে তাই করি। তপু বলছে না, কিন্তু তপুর ব্যবহারে তা যেন স্পষ্ট হচ্ছে। মনে মনে নূপুর বলে, যার যার জীবন শুরুই তো হবে আজ নয়তো কাল। অন্তত ক'টা দিন তাকে স্মরণ করি, তার জন্য কাঁদি। আপনজনের মৃত্যুতে এটুকুও যদি না কাঁদি এখন, তবে কাঁদবো কখন ! শুধু কি ভবিষ্যৎ, শুধু কি সামনে চলা, শুধু কি নিজের সুখ, শুধু কি নিজের ভালো থাকা ! একটু না হয় ক'দিন খারাপ থাকিই ! কী এমন হয় ক'দিন ভালো না খেলে, ক'দিন কাঁদলে, এ তো নিশ্চয়ই মরে যাওয়ার মতো ভয়ংকর কিছু নয়। তপুর সঙ্গে এসব কথা তার মনে মনেই হয়। শেষ অবদি নূপুর লক্ষ্য করেছে, তপুকে পাশার মৃত্যু নিয়েই প্রশ্ন করতে কোথাও যেন আটকাচ্ছে নূপুরের। কিছু জিনিস হয়তো না জানাই থাকা ভালো। দু'দিনের জীবন, কী দরকার অত কিছু জেনে।

সব ফেলে তো সেই চলেই যেতে হয়।

নূপুর নিজের হাতে তপুকে খাওয়ায় করে, ওর গায়ে নিজে লোশন মাখিয়ে দেয়, একটুও নাকি তপু নিজের শরীরের যত্ন করে না। ঠিক এভাবে নূপুর তার ছেলে জয়কেও করতো। তপু যা যা খেতে পছন্দ করে, নির্মলার কাছে জেনে নূপুর নিজে হাতে সেসব তৈরি করে। নূপুর যে তপুকে ভালোবাসে, সেটা আর অন্যভাবে সে বোঝাতে পারে না, পছন্দের খাবার তৈরি করেই সে ভালোবাসে তপুকে, বোঝায়। তপুকে সে এতকাল দূরে সরিয়ে রাখলেও আর দূরে সরিয়ে রাখতে চায় না। আজ তার কেউ নেই, মা নেই বাবা নেই, স্বামী নেই, ছেলে নেই, দিদি নেই, দাদা থেকেও নেই। আছে শুধু দিদির মেয়েটি।

তপুও হয়তো তাই বোঝায় অত দূর থেকে সুদূর অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে নূপুরের জন্য এসে। বাড়িতে ঝামেলা না করে রেস্তোরাঁয় খাওয়ার প্রস্তাব করছে প্রতিবেলা তপু। কিন্তু নূপুর আপত্তি করেছে, কী না, তপুকে ঘরের খাবার খেতে হবে।

বিদেশ বিভূঁইয়ে তো এই জিনিসটাই মিস করবে, মা !

নূপুর বলে। মা বলে ঠিক এরকমভাবে বলতো যমুনা। তপু চমকে ওঠে। তাহলে মা বলে অন্য কেউও ডাকতে পারে, নিজের মা ছাড়া। যমুনা তপুকে বলেছিল, মা আর খালাতে খুব একটা পার্থক্য নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— 'তোকে তোর খালার কাছে রেখে নিশ্চিন্তে অফিস করতে পারতাম, জানতাম আমি যেভাবে তোকে দেখবো, তোর খালাও সেভাবে দেখবে। খালারা তো অনেকটা মায়ের মতোই'।

যমুনার কাছে তপু নূপুরের গল্প শুনেছে অনেক। যমুনা তো তাই করতো, অনেকের জীবনের গল্প শোনাতো, নিজের জীবনের সব কথা তো বলতোই। নিজে যেমনভাবে জীবন দেখেছে, যে অভিজ্ঞতা হয়েছে নিজের, সব বলতো। তপু তার মেয়ে কিন্তু তপুর সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলতো, একটা বয়সের পর তপুকে আর বাচ্চা বা বালিকা মনে করতো না। তপুও তাই, তার জগত ছিল যমুনা। যমুনা তার মা, তার শিক্ষিকা, তার প্রেরণা, তার আদর্শ।

যমুনার কলকাতার বাড়িতে শুধু নাওয়া, খাওয়া, আড্ডা আলোচনা, গান গল্পই হয়না, জরুরি কিছু কাজের কথাও হয়। যমুনার ব্যাংকের টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, বাড়ির ভেতর অগুনতি জিনিসপত্র, এসবের কী হবে ? নূপুরের উপদেশ, তপু যেন যমুনার কলকাতার ব্যাংকের টাকাগুলো তার বিদেশের ব্যাংকে ট্রান্সফার করে, বাড়িটা বিক্রি করার জন্য যা যা করতে হয় করে, গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিলেই চলবে। খুব দ্রুতই কাজগুলো করা যায়। তপুকে ডেকে আনার পেছনে নূপুরের এই উদ্দেশ্যটাও ছিল।

তপুর বক্তব্য, লাখ পঁচিশ টাকা আছে ব্যাংকে, এ টাকা তার দরকার না হলে সে নেবে না। গাড়িটা বিক্রি করা হয়তো উচিত। কারণ গাড়ি সামলানোর জন্য যমুনা নেই। নির্মলাকে জিজ্ঞেস করতে হবে গাড়ির তার দরকার আছে কী না। যদি নির্মলা মনে করে গাড়িটা তার দরকার, তবে নির্মলার জন্য গাড়িটা থাকবে। বাড়িটাও থাকবে। নির্মলা এ বাড়ি কেনার শুরু থেকেই আছে যমুনার সঙ্গে। তারও তো তিনকূলে প্রায়ই কেউই নেই। বাকিটা জীবন এ বাড়িতেই থাকুক। সিস্টারহুডটা চালানোর দায়িত্ব নির্মলার। টাকা তো ওই সংগঠন থেকে আসে, নির্মলার খরচ ওই টাকায় নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আর ব্যাংকের টাকা রইল, প্রয়োজনে নির্মলাও নিতে পারে। আর এ বাড়িতে তপু ছুটি ছাটায় আসবে। মায়ের স্মৃতির কাছে আসবে। নিজেরও তো স্মৃতি কম নেই এ বাড়িতে ! এ বাড়ি বিক্রি করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ক'দিনই বা বছরে তপু আসবে এ বাড়িতে বেড়াতে। তপু বললো, হয়তো দু'তিন বছরে একবার আসার সুযোগ হবে, অথবা হবে না। কিন্তু জানবো তো কোথাও কোনও আশ্রয় আছে আমার। আমার মা'র বাড়ি। যেখানে মা না থাকলেও মা'কে ভালোবাসতো এমন একজন আছে। এই ভাবনাটি বড় শান্তি দেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর কখনো ভাবেনি তপু কলকাতার বাড়ি বিক্রি করতে বাধা দেবে। এ বাড়ি বিক্রি করলে কয়েক কোটি টাকা হবে। এ ছেড়ে দেওয়ার মানে হয় না। টাকা তোমার প্রয়োজন হবে তপু। তুমি বিদেশে লেখাপড়া করছো। কখন কী বিপদে পড়, বলা যায় না। টাকা-পয়সা তুমি কী করে পাবে, মা। নিজের কথা তো ভাবতে হবে ? তোমার তো অনেক খরচ ওখানে। নির্মলার একার জন্য এত বড় বাড়ির তো দরকার নেই। নূপুর বড় কাতর স্বরে বলে তপুকে। তপু বলে এনিয়ে ভাবনার কিছু নেই। সে স্কলারশিপ পাচ্ছে। আর বই লেখার জন্য অ্যাডভান্সড রয়্যালটিও পেয়েছে। শিক্ষকতা শুরু করলে অঢেল টাকাও হাতে আসবে।

নূপুর বড় গম্ভীর কণ্ঠে বলে,— 'আর কোথাও কোনো বাড়ি বা আশ্রয়ের কথা যদি ভাবো তাহলে ব্রহ্মপুত্রর পাড়ে ময়সনিসংহে যে তোমার নানার বাড়ি, সে তো আছে। সেই বাড়িটা এখন আমার। আমি কিনে নিয়েছি। ওটাকেই নিজের বাড়ি ভেবো'।

তপু হেসে বলে,— 'ওটাকে কি নিজের বাড়ি বলে মনে হবে কখনো ? আমি তো যাইনি কোনোদিন ও বাড়িতে। মায়ের ও বাড়িতে স্মৃতি আছে। কিন্তু আমার তো নেই'।

তপু নূপুরকে উত্তেজিত হতে বা উদ্বিগ্ন হতে বারণ করে। বুঝিয়ে বলে বাড়ির দলিল পত্র সব তার কাছেই রইলো। নির্মলা থাকুক। নির্মলা যখন আর থাকবে না, তখন না হয় বিক্রি করার কথা ভাবা যাবে। তবে নির্মলা যতদিন এ বাড়িতে আছে ততদিন নয়।

নূপুর হাঁ হয়ে শোনে তপু যা বলে, সব।

— নূপুখালা, নির্মলা মাসির সঙ্গে, তুমি জানো না হয়তো মা'র একটা লাভ রিলেশন ছিল। দে ওয়ের লেসবিয়ানস। ভেরি লাভিং এন্ড কেয়ারিং। দে ওয়ার টুগেদার অলমস্টো ফর ফিফটিন ইয়ারস। মা নেই বলে তার পার্টনারকে আমরা ঘর থেকে বের করে দেব ? আই কান্ট ডু দ্যাট। ব্যাংকের টাকা থেকে নির্মলা মাসির সংসার খরচা যা দরকার তা নেবে।

অনেকক্ষণ নূপুর কোনো কথা বলতে পারে না। তার মনে হতে থাকে, যা ঘটছে তার চোখের সামনে তা আসলে ঘটছে না, যা শুনছে সে নিজের কানে সে আসলে শুনছে না। নূপুর এক কাপ চা হাতে বাইরের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকে। উঠোনে আম গাছ, আতা গাছ, কাঁঠালিচাপার গাছগুলো দেখে, শিউলি ফুলের গাছ, গন্ধরাজ, জবা ফুলের গাছ — একবার দেখেই গাছগুলো নূপুর চিনতে পারে, এই গাছগুলো তাদের ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের বাড়িতে ছিল। যমুনা কি গাছগুলো লাগিয়েছিল অতীতের কথা ভেবে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকী টবে যে ফুলগাছ আছে, একটিও নেই এমন, যেটি নেই বা ছিল না তার বাপের বাড়িতে। নির্মলা বলেছে গাছ টাছ সব যমুনা শখ করে লাগিয়েছে।

নূপুরের মাথার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে আছে। নির্মলা যেন পাথরের মতো দাড়িয়ে আছে তপু আর নূপুরের মাঝখানে। তপুর এত ভালোবাসা নির্মলার জন্য ! নির্মলা যমুনার সঙ্গী ছিল বলে। আর নূপুর যে বোন ছিল, আদরের ছোট বোন ! নূপুর চায় তপুর যেন জীবনে কোনো অসুবিধে না হয়। টাকা পয়সার অভাব হতেই পারে। স্কলারশিপ পেয়েছে হার্ভার্ডে, পিএইচডি করছে বা রিসার্চ করছে হার্ভার্ডে মানে এই নয় যে সে এক্ষুণি লাখ ডলারের চাকরি পেয়ে গেছে।

নূপুরের রাগটা গিয়ে পড়ে নির্মলার ওপর, ও তো খুব দূরে ছিল না। রান্না ঘরে ছিল। সবার জন্য চা বানাচ্ছিল। কেন এগিয়ে এসে বললো না,— 'তপু তুমি টাকা নাও, বাড়িটা বিক্রি করো, আমার জীবন তো প্রায় শেষ হচ্ছে, তোমার জীবনের সবে শুরু'।

নির্মলা নিঃশব্দে হাতে হাতে চায়ের কাপ দিয়েছে, মুড়ি ভাজা দিয়েছে। নূপুরের জন্য বেশি হয়ে যাচ্ছে এই চা। প্রেমিকা ছিল যমুনার, যমুনাই পুষেছে তাকে, এখন যমুনা না থাকা অবস্থাতেও তাকে পুষে যেতে হবে কেন ! যমুনা তো কোথাও লিখে যায়নি, বলে যায়নি, যে নির্মলাকে আমার টাকা দিয়ে পুষো।

AMARBOI.COM

যমুনার কলকাতার এই বাড়িটাতে এই প্রথম। যমুনার কাছে শুনেছিল বাড়িটা কেমন। যমুনা বলেছিল ঠিক ময়মনসিংহের বাড়ির মতো একটা বাড়ি চাই ওর। ছাদে দাঁড়ালে বিশাল আকাশটা পাবে, বাড়িটার আঙিনায় দাঁড়ালে দেখতে পাবে নদী, চারদিক ছেয়ে থাকবে গাছে, ভেতরটায় শীতল শান্তি। উঁচু সিলিং। বড় বড় জানালা দরজা। এ বাড়িটার আঙিনায় দাঁড়ালে কোনো নদী চোখে পড়ে না, উঁচু সিলিংও নেই। শুধু গাছগাছালিতে সাদৃশ্য আছে, আর আছে ছাদে দাঁড়ালে বিশাল একটা আকাশ পাওয়া। যে বাড়িতে ওর শৈশব কৈশোর কেটেছে, সে বাড়ি যমুনাকে যে এত আচ্ছন্ন করে রাখতো সংসারে কেউ কি জানতো ! ওই বাড়িতে যমুনা'র পা রাখা নিষিদ্ধ ছিল বলেই কি যমুনার আকর্ষণ বেড়েছিল বাড়িটার ওপর। যখন নূপুর যেত বাড়িটায় বা ঘুরে আসতো বাড়িটা থেকে, যমুনা জিজ্ঞেস করতো, জানালাগুলো এখনো খোলা থাকে তো, কাঁচগুলো মোছে কেউ, নাকি ধুলো জমছে, দোতলার জানালা থেকে সুপুরি গাছটার নাগাল পাওয়া যায় ? আর ওই গোলাপের বাগানটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ? মা কি এখন আর চাল কুমড়ো লাগায় না, পায়রা পোষে না ? আমার ঘরটায় কে থাকে এখন ? আলমারিটায় আমার অনেক চিঠিপত্তর আছে, বই আছে, ম্যাগাজিন আছে, ওগুলো কেউ নষ্ট করেনি তো, আমার ঘরের জানালা দিয়ে আকাশটা খুব ভালো দেখা যেত, এখনও যায়, নাকি কোনো গাছ টাছ এসে ঢেকে দিয়েছে ? ঝাড়বাতিটা ? ছাদ থেকে আকাশটা ?

নূপুর সারাদিন উত্তর দিয়ে যেত যমুনার। বিজ্ঞান নিয়ে দিনরাত পড়ে থেকেও, প্রকৃতি আর স্মৃতির কাছে যমুনা মাথা নত করতো। বাড়িটার প্রতিটি ঘর, প্রতিটা আনাচ কানাচ, উঠোনটা, মাঠটা, উঠোনের ওই আতা গাছটা, ওই পেয়ারা গাছটা, ওই আম গাছটা, ওই কাঁঠাল গাছটা, ওই কাঁঠালিচাপা গাছ, ওই গন্ধরাজ গাছটা, শিউলি গাছের কথা বলতে হত। বাবা মা'র কথা জিজ্ঞেস করতো না। অভিমান ছিল হয়তো। কিন্তু বাড়ির ওপর অভিমান ছিল না। মাঝে মাঝে নূপুরের মনে হত, বাড়িটার জন্য নয়, আসলে ওর নিজের শৈশব, কৈশোর, আর যৌবনের জন্য ভালোবাসা। সেদিকে বার বার ফিরে চাওয়া। নিজেকে দেখা। নার্সিসিজম ! নূপুর বুঝে পেত না কেন যমুনা এত বাড়ি বাড়ি করতো, নস্টালজিয়া, নার্সিসিজম, নাকি না পাওয়ার কান্না— যে কারণেই হোক যমুনা বাড়ি-পাগল ছিল। মাঝে মাঝে এত বুদ্ধিমতী যুক্তিবাদী, পদার্থ বিজ্ঞানে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাওয়া মেয়েও অযৌক্তিক কাণ্ড করতো, একবার বললো বাড়ির উঠোনের একটু মাটি এনে দিস তো। মাটি মাটি করে পাগল হল, নূপুর মাটি এনে দিল, সেই মাটি ঢাকার ফ্ল্যাটের টবে রেখে তবে একটা বেলি ফুলের চারা লাগালো। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের বাড়ির উঠোনের সেই মাটি ছাড়া নাকি ফুল ফুটবে না। আসলে যমুনা জন্ম থেকেই ফুল আর ফুল গাছগুলো দেখছে, দেখতে দেখতে আর এসবের মধ্যে বড় বড় হতে হতে এদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওর। যতদূরেই যাক না কেন পরে, সম্পর্কটা রয়ে যায়, ভেতরে কোথাও রয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে তো নূপুর, নাইম, যমুনা তিন ভাই বোনই বেরিয়েছে, বাড়ির প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ আর তো কেউ অনুভব করেনি যমুনার মতো ! যমুনা যখন ইস্কুলে পড়তো তখনই বাড়িতে তার মা'র সঙ্গে সঙ্গে বসে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, বেলি, লিলি, মাধবী লতা, গন্ধরাজ আর নানা রকম গাছ তো লাগাতোই, ফুলকপি, বাধা কপি টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, লাউ, সিম, আলু, ধনেপাতা, নানা কিছুর গাছও লাগাতো, তখনই কি মাটির সঙ্গে সম্পর্ক জন্ম নেয় যমুনার। যমুনার মা বলতো যমুনা বড় হয়ে বোটানিস্ট হবে। তাই সবাই ভাবতো, বড় একটা বোটানিস্ট হয়ে বড় কিছু আবিস্কার করবে, শুধু আবিস্কারে মন ছিল। কোনো একটা গাছ মরে যাচ্ছে তো গবেষণা শুরু করে দিল। লাইব্রেরি থেকে লতা পাতার রোগ শোকের বই নিয়ে এসে দুদিনে বই শেষ করে পণ্ডিত মতো কিছু একটা হয়ে উঠতো। বাড়িতে রাজমিস্ত্রি কোনও কাজে এলে যমুনাও রাজমিস্ত্রির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে লেগে যেত। পৃথিবীর নানা কিছুর প্রতি আকর্ষণ তার বাচ্চা-বয়স থেকেই। কোনোদিন চুপ করে কোথাও বসে থাকতে পারতো না। যখন আট বছর বয়স, নূপুরকে বললো, মনে হচ্ছে বাড়িটার তলায় হয়তো ডায়নোসোরের হাড়গোড় পাওয়া যাবে, অথবা অচেনা অজানা কিছু, চল খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি কোনও খনির নাগাল পাওয়া যায় কি না। নূপুর দু'দিনে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, কুন্তু মাস খানেক খুঁড়েছে যমুনা দিয়ে, ডায়নোসরের হাঁড় পায়নি, তবে তবে নানা রঙ্গের নানা রকম ছোটখাটো জিনিসপত্র পেয়েছে। নানা রকম রঙ্গিন কাচ, মার্বেল, পুরোনা পয়সা, চশমা, ঘড়ি, ছোটছোট পাথর আর তামা বা পিতলের হাতি ঘোড়া, বাঘ ভালুক। সব একটা কাচের বয়ামে রেখে দিত যমুনা আর বলতো এই হাতি ঘোড়াগুলো হয়তো পাঁচ হাজার বছর আগে কেউ বানিয়েছিল। পুরোনো কোনো সভ্যতা ঠিক এই মাটির তলায়। নূপুর হাঁ হয়ে শুনতো। শুধু বাড়িতেই নয়, পাড়ায় অত ছোট বয়সেই একটা বিজ্ঞান মেলায় যোগ দিয়ে চুম্বক দিয়ে বিজ্ঞানের কিছু একটা দেখিয়ে কী একটা পুরস্কারও পেয়ে গিয়েছিল যমুনা। যমুনার পাঁচ বছরের ছোট নূপুর। ছোট্ট নূপুরকে নিয়ে যমুনা প্রতিবছর এ পাড়ার, ও পাড়ার, বা ইস্কুলের বিজ্ঞান মেলায় যেত। এসবে তাকে উৎসাহ দিত তার বাবা। সেই বাবা আর মেয়ের সম্পর্কটা কী করে কবে নষ্ট হয়ে গেল। শুধু একটা বিয়ের জন্য ! বিয়ে না করে বাচ্চা না নেওয়ার জন্য। বিয়ে নূপুর জানে এখন হাড়ে মজ্জায়, একটা কাগজ ছাড়া কিছু নয়। শওকতকে ছেড়ে চলে আসার পর শওকতের ছ'মাসও লাগেনি নতুন বিয়ে করতে।

নূপুর পেছনের দিকে তাকায় আর অবিশ্বাস্য মনে হয় সব ঘটনা। বাড়িতে যমুনা সবচেয়ে বেশী আদর পেতো। বাবা মা, আত্মীয় স্বজন সবার আদর। কারও বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে, যমুনার ডাক পড়তো, যমুনা কুইজ করো, বিজ্ঞানের খেলা দেখাও, কবিতা বলো। যমুনার পেছন পেছন যেত নূপুর। যমুনার জন্য হাততালি দেখতো, যমুনাকে আদর করা দেখতো। দেখতে দেখতে যমুনাকে যতটা ভালোবাসতো নূপুর, তার চেয়েও বেশি ভালবাসতে শুরু করেছিল। যমুনার সঙ্গে বড়রাও পারতো না। কেউ কোনও জাদু দেখালে, পয়সা দিয়ে আর তাস দিয়ে, যমুনা ধরে ফেলতো ওই সব হাতের চালাকি। যে জিনিসগুলো সবার মাথায় আসে না, যমুনার মাথায় কী করে আসতো ওসব ! সে সব কতদিনকার আগের কথা। নূপুর শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে সামনে।

কার সঙ্গে সেই সব দুরন্ত শৈশব নিয়ে কথা বলবে নূপুর এখন আর ! কথা বলার তো কেউ রইলো না। নূপুরের যে সাহস আর যে শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল, তা সে ফিরে পেয়েছে। কিন্তু কী করবে এই শক্তি দিয়ে একা একা। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের বাড়িটি কেনার পর সে ভেবেছিল বাড়িটি সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজিয়ে গুছিয়ে যমুনাকে নিয়ে আসবে, বাড়ি এখন অন্য কারওর নয়, বাড়ি নূপুরের। নূপুর কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করে একটা বাড়ি কিনেছে, বাড়ি নয়, আসলে, এক বাড়ি স্মৃতি কিনেছে। টাকা যদি যমুনা না দিত, তবে কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগারের কোনও ক্ষমতা নূপুরের ছিল না। শওকতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর নূপুরকে সাহায্য করার কোনও প্রাণী ছিল না। ওই ছোটখাটো চাকরি আর নয়, নূপুর মনে অসম সাহস নিয়ে ভাবলো সে রেস্তোরাঁর ব্যবসা করবে। যমুনার দেওয়া এক লাখ ডলার নিয়ে সে শুরু করলো, যে আত্মবিশ্বাস তার কোনোদিন ছিল না, এলো। জ্যাকসন হাইটসের জনপ্রিয় দোকান 'হাটবাজার'এর মালিক ময়মনসিংহের ছেলে, অঞ্জন, নূপুরের অনেককালের চেনা। তার উপদেশ আর সহযোগিতা নিয়ে যমুনার টাকায় নূপুর দিয়েছিল বাঙালি খাবার দোকান, 'মাছভাত'। হাটবাজারের ব্যবসা মার খেয়ে গেল, মাছ ভাত এমন জনপ্রিয় হয়েছিল। এক লাখ ডলার খাটিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে নূপুর বেশ কয়েক লাখ ডলারের মালিক হয়ে গেল। আর টাকার দরকার নেই তার। যমুনার দেওয়া টাকাটা যমুনাকে ফেরত দিয়েও অনেক টাকা হাতে। যমুনা ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিল টাকাটা। সুদ নিজের পকেট থেকেই দিয়েছে। নূপুর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, বাকিটা জীবন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের বাড়িটায় স্মৃতির দোলনায় দুলে দুলে কাটাবে। ব্রহ্মপুত্র তো আছেই, যমুনাও কাছে আছে।

কিন্তু যে যমুনাকে নিজের জীবনে একটি কাজের সাফল্য দেখাবে বলেই নূপুরের উত্তেজনা, সেই যমুনাই যদি দেখতে না পায় শখের বাড়ি, সেই ঘর দোর, যমুনাই যদি বাড়িটার উঠোনে খালি পায়ে না হাঁটে, তবে কী লাভ ওই বাড়িতে ! দু'বোনে মিলে যদি ওই বাড়িতে আর গল্পই না হল, হেঁটে হেঁটে ব্রহ্মপুত্রর পাড়ে বেরিয়ে বাড়ি ফেরাই না হল, তবে কী লাভ ওই বাড়িটায় ! কী লাভ ইট পাথরে !

নূপুরের জীবন আগাগোড়াই ব্যর্থ। যমুনাকে সত্যিকার সার্থকতা বলতে যা বোঝায় কিছুই দেখাতে পারেনি এতকাল। না একটা ভালো চাকরি জোটানো, না জয়কে মানুষ করতে পারা, না স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া, কিছুই হয়নি নূপুরের দ্বারা। শুধু একটা জিনিসই হয়েছিল। এতদিন আমেরিকায় গাধার খাটনি খেটে সে যা রোজগার করেছে, তা দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে এই বাড়িটা কিনতে পেরেছে। যে বাড়িতে যমুনার প্রবেশ নিষেধ ছিল, সে-ই বাড়িতে যমুনাকে প্রবেশ করিয়ে নূপুর দেখাতে চেয়েছিল যমুনাকে, যে, নূপুরের সারা জীবনটাই ব্যর্থ নয়। অন্তত শেষে এসে কিছুটা মুখ বাঁচাতে পেরেছে। নূপুর কল্পনা করেছে যমুনার খুশি হওয়া। কী রকম করে বাচ্চা মেয়ের মতো লাফাবে যমুনা, কী রকম করে সেই সব দিনের কথা বলবে যে সব দিনের কথা বলতে গিয়ে যমুনার কখনো দিন শেষ হত না। যমুনাকে চমক দিতে চেয়েছিল নূপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর চোখ বুজলে চোখের সামনে সেই দিনগুলো দেখতে পায়। দুজনে খেলছে মাঠে, দৌড়ে দোতালায় উঠছে, দোতলার ছাদে উঠছে। সাইকেলে চড়ে পাড়াটা চক্কর দিচ্ছে। পেছনে নূপুর। সাঁতার কাটতে চলে যাচ্ছে পুকুরে, সঙ্গে নূপুর। ব্রহ্মপুত্রে নৌকা চালাবে, ডিঙ্গি নৌকায় কে বসে গান শোনাবে ? নূপুর। ওই দিনগুলো বুকের মধ্যে নিয়ে যমুনা বাঁচতো। জীবনে এত কিছু ছিল তার, তারপরও ওই দস্যিপনাটুকু, রোমাঞ্চটুকু, কখনও ভুলে যায়নি। ওই স্মৃতি না থাকলে যমুনার আর তার, নূপুর কি বেশি দাম দিয়ে বাড়িটা কিনতো ? তার যদি আমেরিকা ছেড়ে দেশে বাস করার ইচ্ছে, ঢাকায় কোনও একটা ফ্ল্যাট সে কিনতে পারতো, কেন ময়সনসিংহে, কেন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে ? সেই দৌড়ে দৌড়ে সারাবছর নদীর পাড়ে যাওয়া যদি কৈশোর জুড়ে না থাকতো, নূপুরের কোনও আগ্রহ জন্মাতো না বাড়ি কেনার। নিজেকেই সে জিজ্ঞেস করে কী কারণে সে বাড়িটা কিনেছে। কিনতেই যদি হত, এই বাড়ি কেন ? আর বাড়ি কি ছিল না ? এর চেয়েও আধুনিক, এর চেয়েও মজবুত ? আসলে থোকা থোকা স্মৃতি কিনেছে নূপুর, মা বাবার স্নেহের স্মৃতি, বুবুর ভালোবাসার স্মৃতি। টাকা দিয়ে হারিয়ে যাওয়া দিন কিনেছে। মুছে যাওয়া পায়ের ছাপ কিনেছে, ধুয়ে যাওয়া একাদোক্কার দাগ কিনেছে। নূপুর যমুনার কলকাতার বাড়ির উঠোনে খালি পায়ে হাঁটছিল, গাছগুলো দেখছিল আর পুরোনো সেইসব দিনের কথা ভাবছিল।

তপু তখন ডাকে দোতলা থেকে। দোতলার বারান্দায় ওর অর্ধেক শরীর মুগ্ধ চোখে দেখে নূপুর। যেন তপু নয়, যমুনা ডাকছে তাকে।

— নূপুখালা। ব্রজদা সহি নিতে এসেছে। তোমাকে ডাকছে।

নূপুর উঠে এলো দোতলায়। ব্রজ কাগজ এগিয়ে দেয়। 'এসএমএসের উত্তর দেওয়া হয়নি। ফোন সঙ্গে নিয়ে বেরোইনি কাল। কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। অনেকদিন হয়ে গেল, দেখি আজই বডি নিয়ে যাবো'।

— আজই ?

নূপুর চমকে ওঠে।

— হ্যাঁ আজই। যে কারণে ওয়েট করতে বলেছিলেন, সে তো হল। মেয়ে আমেরিকা থেকে এসেছে। বডি দেখা হয়ে গেছে। আর দেরি করা যায় না।

— কিন্তু...

— তাড়া তো দিচ্ছিলেন আপনারাই। এখন আবার কী হলো !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলা একটা কলম এগিয়ে দেয়। বাঁ হাতে কাগজ, ডান হাতে কলম। কাগজের লেখা মন দিয়ে পড়তে থাকে নূপুর। সামনে নির্মলা, তপু, ব্রজ আর ব্রজর সঙ্গের লোক কথা বলতে থাকে কোন মেডিক্যালের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে দেওয়া হবে শরীর, কারা কারা দিয়েছে এপর্যন্ত মরণোত্তর দেহ, কোন কোন বিখ্যাত লোক, মাসে ক'টা বডি ওরা পায়।

হঠাৎ নূপুর বলে,— 'দরকার নেই এসবের। মেডিক্যালে বডির অভাব নেই। এসব দেশে দিনে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে, অনেক বেওয়ারিশ লাশ চারদিকে। বুবুর ডেডবডি না হলে এমন কোনো ক্ষতি হবে না কারও, মেডিক্যাল রিসার্চও আটকে থাকবে না, ডিসেকসন রুমেও ছাত্রদের লাশের অভাব হবে না, কাঁটাছেড়া করে ডাক্তারি বিদ্যা শেখার। আমি বুবুকে আমাদের দেশের বাড়ি নিয়ে যাবো। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। বাড়িটা খুব ভালোবাসতো বুবু। ওই বাড়িতে বুবু মানে যমুনাদি বড় হয়েছে, যমুনা যমুনাদি হয়েছে, যে যমুনাদিকে আমরা ভালোবাসি, সেই যমুনাদি। ওই বাড়িতেই বুবু বেড়ে উঠেছিল সবার চেয়ে অন্যরকম হয়ে। ওখানকার গাছ গাছালি খুব ভালোবাসতো বুবু। ওখানকার আলো হাওয়াও। ব্রহ্মপুত্র থেকে যে হাওয়া আসতো, সেই হাওয়া। ওই মাঠটা যা খা করছে এখন, বুবু খেলতো একসময় যে মাঠটায়। সেটায় শুইয়ে দেবো। মাথার কাছে শিউলি ফুলের গাছ। শিউলি ফুল বুবু খুব ভালোবাসতো। আমাকে বরং কী যেন কিনতে হয়, কফিন টফিন, ওসব কিনতে সাহায্য করো। আসলে সত্যি কথা বলতে কী, প্রচুর টাকা থাকলে আজ কাল খুব ধনী লোকেরা যা করে, বরফে ডুবিয়ে রাখে, তাই করতাম। ভবিষ্যতে আবার যেন বাঁচিয়ে তোলা যায়, যখন বরফে রাখা ডেডবডিতে লাইফ আনা যাবে, এরকম কিছু আবিষ্কার হবে। আমি যতদিন বাঁচি, বুবুকে সঙ্গে নিয়েই বাঁচবো। এরপর কী হবে, যা হয় হবে, সব তো আমার হাতে নেই' !

সবাই চুপ। সবার চোখ নূপুরের দিকে, নূপুর আরও কিছু বলে কিনা'র দিকে। কিন্তু ওটুকু বলেই হাতের কাগজ আর কলম রেখে দিলো টেবিলে। কোথাও সই করেনি। নির্মলা, তপু, ব্রজ, ব্রজর সঙ্গের চমশা পড়া দার্শনিক গোছের লোক, কারও মুখে কোনও কথা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৎকার

বাড়ির আঙিনায়, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে, যমুনাকে শুইয়ে রেখেছে নূপুর। শিয়রে শিউলি গাছ। বাঁধানো কবরটির গায়ে শ্বেতপাথরে লেখা একটা এপিটাফও রেখেছে। এপিটাফটি লেখার সময় নানা কিছু ভেবেছে কী লিখবে। লিখে রেখেছে কিছু এই জন্য যে অন্তত মানুষ জানুক কেউ একজন এখানে শুয়ে আছে। নূপুর তো আর সারা জীবন থাকবে না। নিজের কবর তার বাঁধানোর কোনও ইচ্ছে নেই। নিজের উত্তরসুরী বলতে তার কেউ নেই। বাড়িটা তপুকেই সে দিয়ে যাবে। তপু কি আর এ দেশে এসে এ বাড়িতে থাকবে, যদি থাকেই বা বাড়িটা রাখে, বিক্রি না করে, তবে হয়তো যমুনার পাথরে বাঁধাই করা কবরটা তপু আর তার উত্তরসুরীরা রাখবে। না হলে কেউ হয়তো ভাঙবেই, এই কবরের ওপর বাড়ি ঘর বা রাস্তা গড়ে উঠবে, কল কারখানা গড়ে উঠবে। পৃথিবীতে কতকিছুই হবে, কত ভাঙা গড়া। কোটি কোটি বছরে মানুষ কত পাল্টে যাবে, কে যমুনা কোথাকার যমুনা তার হিসেব কে রাখবে ! তবে নূপুর যতদিন আছে, ততদিন যমুনার কোনও অনিষ্ট হতে দেবে না। নূপুর জানে, যমুনা এসব দেখলে বলতো, 'নূপুর, শরীরটা খুব বড় ব্যাপার নয়, তুই ভালোবাসিস, সেটাই বড়। তোর মনটা। আমাকে তোর মনে পড়বে, আমি যে কথাগুলো বলতাম, সে কথা আদৌ যদি ঠিক মনে হয় তোর, বলবি, বুবু ঠিক বলেছিল বা বুবু এরকম করতো, ঠিক আছে আমিও করবো তো ! এতেই আমার জন্মের সার্থকতা। আমি তো আর পাবলিক ফিগার নই, নিতান্তই প্রাইভেট মানুষ। কিছু মানুষ ভালোবাসে। এতেই সুখ আমার। লাশ নিয়ে যারা লাফায়, তারা আত্মায় বিশ্বাস করে। আত্মা বলে কিছু নেই। আমি বিশ্বাস করি না। তোরও নিশ্চয়ই এইসব ফালতু সুপার ন্যাচারাল জিনিসে বিশ্বাস নেই !'

ভাগ্যিস যমুনা নেই, তাই নূপুরের বিশ্বাস, যা তার ভালো লাগছে তা করতে পারছে। যমুনা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতো, কিন্তু নূপুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক স্বাধীনতায় যমুনা হস্তক্ষেপ করেছে, করেছে তো বটেই। আজ যমুনা থাকলে যমুনার লাশকে কলকাতার মেডিকেলে দিয়েই তবে নূপুরকে বাড়ি ফিরতে হত, যমুনাকে কফিনে করে নিয়ে দেশে ফিরতে হত না। তপু শেষ পর্যন্ত আপত্তি করেনি। প্রথমে অবশ্য বলেছিল, 'মা যা চেয়েছিল, যেভাবে চেয়েছিল, সেভাবেই সবকিছু হওয়া উচিত। আফটার অল, তার বডি। আজ সে নেই। কিন্তু তার ইচ্ছে ছিল, মেডিকেল কলেজে বডি দেওয়া। আমরা তার ইচ্ছের মর্যাদা দেব। ব্যস'।

নূপুর খুশি ছিল না তপুর ওভাবে নাকচ করে দেওয়া নূপুরের প্রস্তাব। জানে সে, নূপুরের চেয়ে যমুনার শবদেহ নিয়ে কী হবে না হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তপুর বেশি। নূপুর বোন, কিন্তু বোন হলেও দীর্ঘ বছর দু'বোনের সম্পর্ক শীতল ছিল। টাকাটা যমুনার কাছ থেকে ধার নেওয়ার পরও সম্পর্ক আগের মতো উষ্ণ হয়নি। একটা আড়ষ্টতা ছিলই নূপুরের। জয়কে রিহ্যাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য যমুনা যেভাবে চেষ্টা করেছিল, আর সে কারণে নূপুর যেভাবে যমুনাকে অপমান করেছিল, সেইসব গেঁথে গিয়েছিল সম্পর্কে। একের পর এক বছর পেরিয়েছে, নূপুর কবর দিতে পারেনি তার অপরাধবোধ। নূপুরের হেরে যাওয়াটা নূপুরকে কুণ্ঠিত করে রাখতো।

আজ সে এসেছে এখানে যমুনার ইচ্ছের বাইরে একটা সিদ্ধান্ত নিতে যেখানে উপস্থিত যমুনার নিজের মেয়ে। যে মেয়েটাকে মানুষের মতো মানুষ বানিয়ে তবে তার মা দুনিয়া ছেড়েছে, ব্যর্থতা শুধু নূপুরেরই। আবারও সেই জয়ের না থাকা, বেঁচে থাকলে কী কী হতে পারতো ও, সেগুলোরই হিসেব করছিল শুয়ে শুয়ে। রাত এগারোটায় 'নূপু খালা,জেগে আছো ?' বলে ঘরে ঢোকে তপু।

নূপুরের দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেয়ে বলে, 'তোমার সিদ্ধান্তই ফাইনাল সিদ্ধান্ত, নূপু খালা। আমি জানি মা তোমাকে কী ভীষণ ভালোবাসতো। তুমি কতটা বাসতে দেখিনি। কিন্তু মার ফ্যামিলিতে তুমিই একমাত্র যে মা'র দুঃসময়ে পাশে ছিলে। যে লোকটা, মানে আমার সো কলড ফাদার, আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, মা তাকে না সরালে আমিও বাঁচতাম না, মাও হয়তো বাঁচতো না আলটিমেটলি। আই ডোন্ট লাইক কিলিং। মা অন্যায় করেছে। বাট মার ওই সময় আর কোনও উপায় ছিল না, সে আমি বুঝি। ওই অবস্থায় পড়লে তুমি বা আমি হয়তো একই কাজ করতাম, যা মা করেছিল। তুমি ওই সময় মার পাশে বোনের মতো, মায়ের মতো, বন্ধুর মতো ছিলে। মা কখনও তোমার ওই উপকারের কথা ভোলেনি। তোমার ডিসিশান নূপুখালা, যদি দেশে নিয়ে যেতে চাও মা'কে, নিয়ে যাও, আমি আপত্তি করছি না। মা হয়তো তোমার সিদ্ধান্তই মেনে নিতো। হ্যাঁ ঠিক যে মা তার মরণোত্তর দেহ মেডিক্যালে দিয়ে গেছে, কিন্তু সে তো পাঁচ বছর আগে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ বছরের মধ্যে মানুষের সিদ্ধান্ত তো পাল্টায় ! পাল্টায় না ? তুমি নিয়ে যাও। আর তাছাড়া বড়ি মেডিক্যালে দেওয়ার ডিসিশান নেওয়ার সময় মা যদি জানতো তার ময়মনসিংহের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ আছে, তবে হয়তো তাই চাইতো মা, তার বাড়িতেই কবর হোক চাইতো। মেডিক্যাল সায়েন্সের মার বডি ছাড়াও চলবে'।

নূপুরের চোখে তখন জল, সে তপুর হাত দুটো নিজের দিকে টেনে তপুকে জড়িয়ে দু'গালে, কপালে চুমু খায়। ঠিক এভাবে যমুনাও খেত তপুকে চুমু। তপু টের পায় স্পর্শের মিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অনেক কেঁদেছে সে যমুনার জন্য, একা একা হার্ভার্ডের ঘরে বসে চোখের জলে ভেসে গেছে। চোখে বোধ হয় আর জল নেই তপুর। সে আর কাঁদবে না। অন্তত নির্মলা আর নূপুরের সামনে নয়। যমুনার ঋজুতা আর দৃঢ়তা তপু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। যমুনার সংবেদনশীল মনও পেয়েছে। আজকাল সময় পেলেই যমুনাকে সে চিঠি লেখে। এই একটি কাজই সে যুক্তিহীনের মতো করে। তার মা মৃত, এই চিঠি কোনওদিন পড়তে পারবে না, জেনেও সে লেখে। লিখতে লিখতে একটা ব্যাপার লক্ষ করে তপু, তার যে যমুনার মারা যাওয়ার খবর শুনে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, সেটা কমেছে অনেক। চিঠিতে তার সব অনুভূতির কথা সারাদিন কী কী হল, কার সঙ্গে দেখা হল, কী কথা হল, ফিজিসিস্টরা নতুন নতুন কী সব বলছেন, সব লেখে। এতে করে অন্তত একটা জিনিস হয়, যাকে তার মনের সব কথা খুলে বলতো এখনও তাকেই খুলে বলতে পারছে সব, মুখে বলছে না, লিখে বলছে, কিন্তু বলছে তো ! তার একা লাগে না। মনে হয় না, যমুনা, যে তার মা ছিল, একই সঙ্গে বন্ধু ছিল সবচেয়ে বড়, নেই।

AMARBOI.COM

নূপুর কফিন নিয়ে ঢাকার বিমানে ওঠে। নূপুরকে বিদেয় দিয়ে বাকিটা সময় বিমান বন্দরেই কাটায় তপু। ঘন্টা দুই পর তপু আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হয়। একা বাড়ি ফেরে নির্মলা। ঘর দোর সেই রকমই রেখে গেছে। নির্মলাই থাকবে বাড়িতে। তপু মাঝে মাঝে আসবে। নূপুরও হয়তো কখনও আসবে। তপু বেড়াতে এলে বা ছুটি কাটাতে এলে হয়তো নূপুর আসবে তপুকে দেখতে। তপু কি যাবে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে কোনোদিন ? এই প্রশ্ন নূপুর করেনি। নূপুরের মনে হয়েছে যে নানা নানি বেঁচে থাকতে একবার দেখতে চায়নি তপুকে, আমন্ত্রণ জানায়নি তপুকে, সেই তপু কেন আসবে ওই বাড়িতে ? আর নূপুরই বা খালা হয়ে কী করেছে তপুর জন্য ? কিছুই না। বিদেয় নেওয়ার সময় নূপুর মাথা নিচু করে ছিল লজ্জায়। একবার বলতে চেয়েছিল, 'আর কারও জন্য আসিস না, কাউকে ক্ষমা করিস না, তোর মার জন্য আসিস, তোর মার শরীরটা তো রইল'। বলতে গিয়েও বলেনা নূপুর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ ওইসব শরীর টরীরে তপু বিশ্বাস করে না, তা সে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

কত মানুষ বলে, প্রাণ ছিল, উড়ে গেছে, আত্মা আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। না, নূপুরও এসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু যমুনার ওই মৃত শরীরটাকে, তার, সে জানে না কেন, মনে হয় যমুনা। হ্যাঁ প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, সেগুলো নেই, কিন্তু কফিনে শুয়ে থাকা মানুষটা তো সেই মানুষটাই। সেই মুখ, সেই নাক, সেই হাত, সেই পা, সেই বুক, সেই চিবুক।

মাঠে গন্ধরাজ গাছের তলায় যখন মাটি খোঁড়ার লোক ডেকেছিল, সবাই বলেছিল, মুসলমানদের মধ্যে কফিনে শোয়াবার নিয়ম নেই, বাঁশের ওপর কাফনের সাদা কাপড়ে আর ধাঁড়িতে মুড়িয়ে শুইয়ে দিতে হয় আর শরীরের ওপর গাদা গাদা মাটি ফেলে দিতে হয়। নূপুর শুনেছে কী করে লোকের কবর হয়। শোনাটুকুই। বাবা মা মারা গেলে কবরখানায় আর যে লোকই যাক, নূপুরের যায়নি। কারণ মেয়েদের নাকি কবরখানায় ঢুকতে নেই। কিন্তু যমুনার কবর হওয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এপিটাফ লিখতে কাউকে পাঠায় নি, নিজে গেছে, নিজে বসে থেকে লিখিয়ে এনেছে। ছোট বাজারের এক দোকানী শ্বেত পাথরের ওপর লিখলো। লেখার সময় লোকটা বার বার অবশ্য বলছিল, 'আপনি বাড়ি চলে যান, লেখা হয়ে গেলে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসা হবে পাথর' নূপুর বলেছে, 'আমি বসে থাকি, আমার কোনো অসুবিধে নেই। আর বাড়ি তো খালি, বাড়িতে যাওয়ার অত তাড়াও আমার নেই'।

নূপুর নিজে হাতে শ্বেত পাথরটা নিয়ে বাড়ি ফেরে। শ্বেত পাথরের গায়ে খোদাই করা কালো অক্ষরে লেখা, 'আমি আমার মতো বেঁচেছি, তুমিও তোমার মতো বেঁচে থেকো'। এটুকুই। শিউলি গাছের তলায় এই এপিটাফ কে দেখবে ভবিষ্যতে, তপুই হয়তো অথবা তার ছেলে মেয়ে অথবা ছেলে মেয়ের ছেলে মেয়ে। তার ছেলে মেয়েরা যদি বাংলা না বুঝতে পারে, বুঝবেও না হয়তো কী লিখেছে, না বুঝলে হয়তো অনুবাদ করিয়ে নেবে। অথবা কে জানে, কেউ একজন হয়তো বাংলা ভাষা শিখে এই ভাষায় বই লিখবে।

ক'জন মামা আর কাকা দেখে গেছে যমুনার কবর। ছোটবেলার খেলার সাথীরা এসেছে। সবাই খুব অবাক, শহরে এত কবরখানা থাকতে বাড়িতে কেন ! নূপুর ম্লান হেসেছে। নাইম একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিল ময়মনসিংহের ওপর দিয়ে, থেমেছে। তার নাকি পনেরো মিনিটের বেশি সময় নেই।

— 'বুবুকে তো বাড়িতেই রাখলাম'। নূপুর বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— 'মানে ?'

— 'মানে তোমরা যা বল আর কী, কবর দেওয়া। সেটা বাড়িতেই হল'।

নূপুর নাইমকে মাঠের বাঁধানো কবরটা দেখায়।

— 'তোর মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে নূপুর'।

নাইম ধমকে বলে। অনেকক্ষণ ধরে বলে, মাথা খারাপ না হলে কোনও মানুষ যে এই উদ্ভট কাজটি করবে না। নাইম এই ধারণাটা গেঁথে দিতে চেষ্টা করে নূপুরের মস্তিষ্কে। নূপুর চুপ করে থাকে। তার মনে হয় নাইম বেশিক্ষণের জন্য না এসে পনোরো মিনিটের জন্য এসে ভালোই করেছে। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করেছে নাইমের প্রস্থানের। এ বাড়ি নাইমের নয়। এ বাড়ি নূপুরের, নূপুরই সিদ্ধান্ত নেবে এ বাড়ির মাটিতে সে কী পুঁতবে কী পুঁতবে না। যমুনার শরীর কী হবে না হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও আজ নেই নাইমের। তবে কীসের জোর তার গলায় ? সে বেশি বোঝে ! নূপুরের ঠোঁটের কোণে হাসি। এই সব মানুষের ভয়ে নূপুর চিরকাল গুটিয়ে থেকেছে। আজ তার রাগ হয় সেই সব ভয়ের দিনগুলোর কথা ভেবে। নাইম বা তার বউ কী বলবে, এই ভয়ে সে শওকতকে ডিভোর্স করেনি। তার কাকা মামা, তার পুরোনো প্রতিবেশীরা শুনে কী ভাববে তাই সে শওকতের মার সহ্য করেছে, অকথ্য অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে ত্যাগই করেছে শওকতকে। কই তাকে কেউ কিছু বলার সুযোগ কি পাচ্ছে এখন ? পেতো, যদি দেখতো নূপুর একটা অসহায় অবলা নারী। নূপুর এখন জীবনের শেষ কটা বছর নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যখন যমুনা বারবার নূপুরকে বলতো আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলতে। আমেরিকায় পা দেওয়ার কদিন পরই নূপুর চাকরি করতে শুরু করেছে। বেতন গিয়ে জমা হত জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। নূপুর যমুনাকে বলতো, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে অসুবিধে হচ্ছে না। আলাদা অ্যাকাউন্ট করবো কেন, আমাদের কী ডিভোর্স হচ্ছে নাকি, নাকি শওকত টেইক কেয়ার করছে না !

— টেইক কেয়ার করছে শওকত। কিন্তু তারপরও নিজের নামে অ্যাকাউন্ট কর।

— শওকত ভাববে আমি তাকে বিশ্বাস করছি না।

— যে যাই ভাবুক, তুই আলাদা অ্যাকাউন্ট কর। আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় না। সারাজীবন সুখে শান্তিতে বাস কর। কিন্তু অ্যাকাউন্টটা তোর হোক।

নূপুর তখনও যমুনার উপদেশকে ফালতু বলে উড়িয়ে দিয়েছে। উড়িয়ে দিয়েছে কারণ শওকত উড়িয়ে দিতে বলেছিল। বলেছিল, 'নিজের তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজবেন্ড নেই, সংসার নেই, সমাজ নেই। হাজবেন্ড থাকলে যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকতে হয়, এটাই তোমার বোন জানে না। জানবে কী করে ! তোমাকে কুবুদ্ধি দিয়ে তোমার মাথাটা নষ্ট করছে। '

একসময় আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলেছে নূপুর। টাকা যত শক্তি দিয়েছে নূপুরকে, তত আর কিছুই দেয়নি। যমুনাও সম্ভবত দেয়নি।

জয়ের জন্য গাড়ি কিনেছিল নূপুর। যমুনা শুনে বলেছিল, — কাজটা ভালো করিসনি নূপুর। ও গাড়ি না চাইতেই গাড়ি কিনে দিয়েছিস, পনোরো বছর বয়সী ছেলে গাড়ি চালাবে কেন।

— ষোলো বছর তো এইতো হচ্ছে। ষোলোতেই আমেরিকায় গাড়ি চালাতে পারে।

— জয়ের গাড়ির দরকারটা কেন শুনি। ও ইস্কুলে যাবে, অন্য কোথাও যাবে, ভালো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে। মেট্রো আছে, বাস আছে।

— তুমি জানো না বুবু। গাড়ির একটা দরকার হয়। ওর অনেক বন্ধু লং আইল্যান্ডে থাকে। ওখানে যেতে চাইলে আমরা গাড়ি ভাড়া করে ওকে ওর বন্ধুদের বাড়ি পৌঁছে দিই। আবার ওকে নিয়ে আসার জন্যও যেতে হয়। ও বলেছে, ওর একটা গাড়ি হলে ভালো হত।

— ভালো হত। অবশ্যই। কিন্তু বয়সটা হতে দে।

— এই দেশে সব ছেলেই ষোলো বছর হলেই গাড়ি চালায়।

— সব ছেলেই চালায়। এটা আমি বিশ্বাস করিনা।

— তুমি এ দেশে থাকো না। তুমি জানো না। আমি এ দেশে থাকি।

শওকত বারবার নূপুরকে বলেছে, সব ছেলেরই গাড়ি আছে, অথচ জয়ের গাড়ি নেই, ভাবলে তার মরে যেতে ইচ্ছে করে লজ্জায়। শওকতের কাছে অত টাকা নেই গাড়ি কেনার। খুব দামি একটা গাড়ি শেষে নূপুর নিজেই কিনে দেয় জয়কে। যমুনার কোনও উপদেশই বলতে গেলে নূপুর মানে না।

জয় যখন এই গাড়ি নিয়ে বন্ধুদের বাড়িতে বসে ড্রাগ সেবন করার পর লং আইল্যান্ড থেকে ফিরছিল, গাড়ি ধাক্কা খেলো একটা থামের সঙ্গে, তখন জয়ের আর বাঁচার জন্য কোনও যুদ্ধ করতে হয়নি, মাথায় আঘাত লেগে ওখানেই রক্তক্ষরণ, ওখানেই মৃত্যু। অন্য দিনের মতো সেদিনও নূপুর ফোনে জয়কে বলছিল, বাবা রাত হয়ে গেছে তুমি থেকে যেও বন্ধুর বাড়িতে। সকালে ফিরে এসো। অথবা আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। না, রাতেই সে ড্রাইভ করবে। রাতেই সে যা ইচ্ছে খাবে, যেখানে খুশি সেখানে যাবে। 'লাইফ ইজ ফান', নূপুরকে বুঝিয়েছে, 'ইউ গাইজ ডোন্ট হ্যাভ এ লাইফ, হোয়াই ডোন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেট এ লাইফ'। জয় প্রায়ই বলেছে এমন কথা। যে রাতেই জয় লং আইল্যান্ড যায় আর রাত করে বাড়ি ফেরে, নূপুর দরজা খুলে বসে থাকে আর ঘড়ি দেখতে থাকে। জয় আসবে, জয়কে খাওয়াবে, শোওয়াবে, তারপর নিজে শুতে যাবে। জয় গাড়ি চালাতে থাকলে নূপুর ফোন করে না। গাড়ি চালানোর সময় ফোন বাজালে আবার ক্ষতি হয় যদি। ফোন এল সেদিন, নূপুর দ্রুত ধরলো সে ফোন, তবে সে ফোন জয়ের ফোন নয়, পুলিশের ফোন।

শওকত দেখতে গেছে জয়ের থেতলে যাওয়া শরীর। নূপুর যায়নি। নূপুর ওভাবেই দরজার কাছে ঠাঁয় বসেছিল। সকালে তিনটে সুটকেসে কাপড় চোপড় আর নিজের জরুরি জিনিসপত্র নিয়ে নূপুর বেরিয়ে যায়। শওকতের ঘর থেকে সেই তার শেষ বেরোনো। আর পেছন ফিরে তাকায়নি। চেনা পরিচিত অনেকে ছিল। কোথাও না উঠে কাছের একটা হোটেলে ওঠে। সেই ভালো, ভেবেছে নূপুর। কারও বাড়িতে আশ্রয় না-চাওয়ার মতো সুখ আর কী আছে ! হোটেলের রুম ভাড়া নিতে কিছু টাকা খরচ হবে, কিন্তু দিনভর তো কারও একশ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। ওখান থেকেই একটা ভাড়া বাড়ির খোঁজ করে নূপুর। ভাড়া বাড়ি বলতে কারও বাড়ির বেইসমেন্টে একটা রুম। মাটির তলায় থাকা। নূপুরের অসুবিধে হয়নি। চেনা পরিচিতদের সাহায্য পেয়েছে। এত দীর্ঘ বছর আমেরিকায় থেকে কাজ করে আজ কেন বেইসমেন্টের একটা রুম জোটে কপালে ! কারণ যা সে কামিয়েছিল, তা জমিয়েছে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে, আর অন্ধের মতো জয়এর পেছনে খরচ করেছে। জয়কে বুঝতে দিতে চায়নি জয় কোনো কোটিপতির ছেলে নয়। গরিব দেশ থেকে ধনী দেশে পাড়ি দেবো, ধনী দেশে যে সন্তান জন্মাবে, তারা ধনী দেশের ধনীদের মতো জীবন যাপন করতে চাইবে। এ ভালো জানে নূপুর। নিজের ইমিগ্রেন্ট পরিচয়, নিজের বাদামী রং, নিজের কালো চুল, নিজের ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ভাষা ঢাকা দিতে একটা কালো পর্দা কিনেছিল, সেই পর্দার মূল্যই কোটি টাকা। ছেলে জয় যেন কালো পর্দার আড়ালের জিনিসগুলো কিছুই না দেখে। দামি সেলফোন, দামি ল্যাপটপ, দামি টিভি, দামি কাপড়চোপড়, দামি আসবাব জয়কে উজার করে দিয়েছিল। ধনকুবেরের ছেলে যেভাবে জীবন যাপন করে, জয়কে সেভাবেই দিয়েছে জীবন যাপন করতে, যেন মনে তার কোনও কখনও কোনও কষ্ট না হয় তার বাবা মা আত্মীয় স্বজন গরিব দেশের লোক বলে, তারা কেউ সাদা আমেরিকান নয় বলে, আমেরিকার উচ্চারণে ইংরেজি বলতে জানে না বলে, ছোট চাকরি করে বলে।

প্রায় পাঁচ বছর হল শওকতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই নূপুরের। নূপুর একটা চিঠি লিখে বেরিয়ে এসেছিল। চিঠিটা এরকম, 'আমি যাচ্ছি, আমার ছেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর জন্য আমি তোমাকে দায়ী করছি, তোমার পরামর্শ মতো বা আদেশ মতো আমি জয়কে বড় করেছিলাম, আমার মতো করে কিছু করতে, সেই বিয়ের পর থেকেই, তুমি কোনোদিন আমাকে দাওনি। জয় নেই। এই সংসারের কোনও আকর্ষণ আর নেই আমার কাছে। তোমার সেবা আমি অনেক বছর করেছি। এবার নিজের সেবা করতে যাচ্ছি। কারণ এ বাড়িতে থাকলে নিজের অস্তিত্ব, নিজের সত্তা, নিজের বোধবুদ্ধি সব বিসর্জন দিয়ে থাকতে হতো।

আমার খোঁজ করো না। আমি যেখানেই থাকবো, ভালো থাকবো, অন্তত তোমার সঙ্গে সংসার করতে গিয়ে যে যন্ত্রণা আমি সয়েছি, এই যন্ত্রণা তো আমার সইতে হবে না। একটু অর্থনৈতিক অবস্থা হয়তো খারাপ হবে, তাতে কী ! শান্তি তো থাকবে। কারও দাসি হয়ে তো থাকতে হবে না।

জয় নেই। আমার আর কোনও পিছু টান নেই। এখন আর দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে অসহ্য দিন কাটানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই। এবার নিজের ইচ্ছেকে মর্যাদা দেবো আমি। সারা জীবন তো দিইনি। বাকিটা জীবন নিজের মতো করে বাঁচবো।

জয়এর ডেডবডি নিয়ে কী করবে, সে নিয়ে আমার কোনও উৎসাহ নেই। ওর মৃত মুখ আমি দেখতে চাই না। ওকে দেশে কবর দেবে নাকি এখানে, সে সম্পূর্ণ তোমার সিদ্ধান্ত। তোমার সিদ্ধান্তেই এ যাবৎ সংসার সন্তান চলেছে। জয়এর জীবন কী ক্রম হবে তা নিয়ে যেমন জয়এর জন্মের পর আমার কোনও সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ছিল না, জয়এর মৃত্যুর পরও যে আমার সিদ্ধান্তের কোনও গুরুত্ব থাকবে না, সে আমি জানি বলেই আমি বাড়ি ছাড়লাম। আমার অভাব তোমার অনুভব করার কথা নয়। অভাব যদি একান্তই অনুভব করো, সে তোমার জন্য বাজার করা, রান্না করা, মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা, তোমার ঘর পয়-পরিস্কার রাখা, তোমার বিছানা গুছিয়ে রাখা, তোমার কাপড় চোপড় কেচে ইস্ত্রি করে রাখা, তোমার যখন প্রয়োজন তোমাকে সঙ্গ দেওয়া, এসবের অভাবই অনুভব করবে। এর জন্য যে কোনও কোনও চাকর রেখে নিলে পারো, অবশ্য এতে তোমার টাকা খরচ হবে অনেক। কিন্তু বিয়ে করে নিলে আর কোনও সমস্যা নেই। বউএর উপার্জিত টাকাও তুমি ভোগ করতে পারবে, ওকে চাকর বাকরের মতো ব্যবহারও করতে পারবে। আমার ভাবতে লজ্জা হয়, যে মানুষটা কোনও অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেনি, পুরুষের কোনও বুলিকে পাত্তা দেয়নি, সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছে নিজের মতো করে বাঁচার জন্য, তার বোন আমি ! সত্যি বলছি আমি আমার যমুনা বুবুর বোন, ভাবতে আমার লজ্জা হয়। আমি আমার বুবুকে কত ঘৃণা করেছি, কত তার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছি, এমনকি নিজের বোনকে এই বিদেশ বিভুঁইএ বাড়ি থেকে বেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দিয়েছি। তোমার কারণেই দিয়েছি। তুমি আমার মাথাকে দিনের পর দিন আমার বোনের বিরুদ্ধে বলতে বলতে বলতে বলতে এক রকম বিগড়ে দিয়েছিলে। আমি তো এমন ছিলাম না আগে। তুমিই আমাকে আমার প্রিয় বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বারণ করেছিলে বলে আমি যোগাযোগ করিনি। যে বুবু আমার মা, আমার বন্ধু, আমার বোন, আত্মীয় বলতে একজনই আছে, তার সঙ্গে আজ আমার কোনও যোগাযোগ নেই। আমিই রাখিনি। বুবুর কথা যদি শুনতাম, তাহলে জয়কে মরতে হয় না। বুবুর কথা শুনলে আমি রিহ্যাব-এ টেনে হিঁচড়ে দিয়ে আসতাম। বুবু কত অপমান সয়েও জয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। দোষ শুধু তোমার নয়, দোষ আমারও। তুমি আমার বোধবুদ্ধি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বুবু তো আমার বোধ জাগানোর কম চেষ্টা করেনি। তোমার কথা শুনেছি, বুবুর কথা কেন শুনিনি ! দোষ আমারও অনেক।

মানুষের বোধোদয় ঘটে, কারও আগে, কারও পরে। আমার না হয় পরেই ঘটলো, কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে, ঘটেছে। দেরিতে হলেও ঘটেছে। বাকিটা জীবন, সে যতদিনই বাঁচি আর যাকেই প্রয়োজন হোক, তোমাকে প্রয়োজন হবে না।

আমার খোঁজ করো না'।

AMARBOI.COM

নূপুরের এখনও সেই দিনগুলো চোখের সামনে ভাসে। জয়কে নূপুর দোষ দেয় না, জয়ের পরিণতির জন্য দোষ দেয় শওকতকে, আর নিজেকে। যমুনা যখন রিহ্যাবএর কথা বলেছিল, নূপুর এ নিয়ে শওকতের সঙ্গে কথা বলেছিল,— মনে হয় রিহ্যাবে দেওয়া দরকার জয়কে।

শওকত চোখ কুঁচকে বলেছিল, কেন ?

বুবু বলছিল জয় নাকি ড্রাগ নেয়।

শওকত দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিল— তোমার বোন ড্রাগ নেয়। আমার ছেলে নেয় না। তোমার বোনের চরিত্র কী তা সবাই জানে। কত লোকের সঙ্গে শুয়েছে ? সে কি না, কত বড় সাহস আমার ছেলের নিন্দা করে ! আসলে তোমার বোন বলে আমি তাকে অ্যালাও করেছি আমার বাড়িতে ঢুকতে, না হলে কোনও ক্ষমতা ছিল আমার বাড়িতে ঢোকার ?

— আমার জন্য এসেছে। আমি না থাকলে কি আসতো !

— আমি চাইনা সে আমার বাড়িতে আসুক বা থাকুক। এক দিনও, এক ঘন্টাও থাকুক চাই না। তুমি না থাকলে আমি আজ ঘাড় ধরে দুশ্চরিত্র মহিলাকে বের করে দিতে পারতাম ! একটা জারজ বাচ্চা নিয়েছে। আবার একটা লোককে, যার সঙ্গে শুয়েছে, তাকেই খুন করেছে। এর তো ফাঁসি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত দেশে, নয়তো সারাজীবন জেলের ভাত খেতে হত। আজ কি না তিনি আমেরিকায় বেড়াতে আসেন। ছি। এর মুখ কী করে দেখ তুমি ! দেখ খোঁজ নিয়ে আমেরিকায় কার পয়সায় এসেছে। কারা আনে তাকে, কী জন্য আনে, খোঁজ নাও। আমার ছেলের ধারে কাছে যেন ওই মহিলা না যায়। নিজের ছেলে নেই তো, তাই হিংসে করছে তোমাকে। শুধু তোমার বোন বলে, নাহলে...'

শওকত দাঁতে দাঁত চেপে হাতগুলো নাড়তে থাকে এদিক ওদিক। তার আসলেই ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে যমুনাকে।

— যে এমন দুশ্চরিত্র বোনকে সাপোর্ট করে, তারও চরিত্রও খারাপ।

শওকত জোরে বলে। যেন যমুনা অন্য ঘর থেকে শুনতে পায়। নূপুরের হাত পা কাঁপে। এত বছর ধরে শুনছে একই কথাগুলো, তারপরও তার কাঁপন যায় না। নূপুর আরও কুণ্ঠিত, আরও সংকুচিত হতে থাকে। এই কথাগুলো কেঁচোর ওপর নুন যেমন কাজ করে, নূপুরের ওপর ঠিক তেমন কাজ করে। আর সেটা শওকত সবচেয়ে ভালো জানে। নূপুরের ধীরে ধীরে রাগ জন্মায় যমুনার ওপর, আবার শওকতের অযথা গালিগালাজ যেন যমুনার কানে না যায়, তাও সে চায়।

জয়এর ড্রাগ সেবন নিয়ে নূপুর হয়তো অজ্ঞ ছিল, তার মনে হয় শওকত ছিল না। শওকত জানতো কোথাও ভুল হচ্ছে, কিন্তু তারপরও সে ভুলটাকেই ঠিক ভেবেছিল। ধনীর ছেলেরা যদি ড্রাগ খেতে পারে, জয় খাবে না কেন ? জয় তো আর রাস্তার ফকিরদের সঙ্গে বা গরিব ইমিগ্রেন্টদের সঙ্গে বসে খাচ্ছে না। জয় রীতিমত লং আইল্যান্ডের সাদা আর ধনী বন্ধুদের সঙ্গে চলছে। এ না খেলে হয়তো স্ট্যাটাসটাই রাখা যেত না।

নূপুরের জানতে ইচ্ছে করে না শওকত কতটা অনুতপ্ত। জয়ের মৃত্যু নূপুরকে সজাগ করেছে। যমুনার আর নূপুরের মধ্যে পার্থক্য হল, যমুনা তার সন্তানের মৃত্যুর আগে সচেতন হয়েছে, আর নূপুর হয়েছে পরে। নাহ, আর দুঃখ করে লাভ নেই। জয় তার একার সন্তান ছিল না। দুজনেরই রক্ত ছিল জয়ের শরীরে। জয় সেই বাচ্চা বয়স থেকে হিংসুক, এটা চাই ওটা চাইএর বায়না, কাউকে নিজের বিছানায় বসতে দেবে না, কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না, কারও সঙ্গে হেসে কথা বলবে না। এসব শওকতের রক্ত। নূপুরের যদি সামান্য রক্ত পায় ও, তাহলে নূপুরের মতো হাসিখুশি কেন হল না জয় ! নূপুর এই প্রশ্নের উত্তর পায় না। তাহলে জিন টিনের ব্যাপার নেই। বাচ্চাকে কী পরিবেশে বড় করো, সেটার ওপরই নির্ভর করে অনেক কিছু ! রাজপুত্রের মতো জয়ের আচরণ। রাশি রাশি খাবারের অর্ডার দেবে, তার সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই। দৌড়ে গিয়ে কিনে এনেছে শওকত আর নূপুর সেই সব খাবার। প্রচুর টাকা গেছে, সেদিকে কোনওদিন ফিরে তাকায়নি জয়। জয় দু'বছর বয়স থেকে কোনোদিন ঘরে তৈরি খাবার খায়নি। ঘরের খাবারকে বলতো ডিসগাস্টিং। গরিব দেশের খাবার। ভাত মাছ ! ডিসগাস্টিং। কোথায় এসব কথা বা আচরণ শিখত জয়, নূপুর জানে না।

নূপুর বলতো, বাড়ির খাবার ভালো, ভালো খাবার খাও।

শওকত নূপুরকে ধমক দিয়ে বলতো, যে খাবার আমার ছেলে খেতে চাইবে, সে খাবার যেখান থেকে পারি, যত টাকা দাম হোক, দেব ছেলেকে কিনে।

এরপর থেকে জয়এর অভ্যেস হয়েই গিয়েছিল রাশি রাশি খাবারের অর্ডার দেওয়া। শওকত জয়এর দরজার সামনে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো। এসব দিনের পর দিন দেখতে দেখতে নূপুরও তার অজান্তে অংশগ্রহণ শুরু করেছে। তার ভয় হত, জয় নূপুরকে কাছে ডাকছে না, শওকতকে ডাকছে, শওকতকে পছন্দ করছে। তখন নূপুরও শুরু করলো জয়এর অর্ডার পালন করতে। অল্প বয়স থেকে জয় সিদ্ধান্ত নেয় সে কী খাবে, কী পরবে, কী পড়বে, কখন ঘুমাবে, কখন জাগবে, তার কী কী চাই, কী কী না চাই সব। নূপুরও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতো জয়এর মনোযোগ আকর্ষণ করতে। জয় যেন নূপুরকেও খানিকটা ভালোবাসে। যেন অবহেলা না করে। যেন ধমকে কথা না বলে। যেন ঘৃণা না করে। এরপর শওকতের আর নূপুরের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, কে জয়ের স্বীকৃতি পাবে, শওকত নাকি নূপুর। সে কী ভয়ংকর প্রতিযোগিতা। জয় তার ঘর থেকে আওয়াজ দিলে শওকত আর নূপুর দুজনও হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায়। কী চাই বাবা, কী খাবে বাবা, কিছু লাগবে বাবা ?

ফ্ল্যাটের দুটো বড় ঘর ছিল জয়ের, একটা জয়ের শোবার ঘর, শোবার ঘরে পালঙ্ক, প্লাজমা টিভি, হোম থিয়েটার, প্রজেক্টর, নানা কিছু। আরেকটা ঘর লেখাপড়া আর খেলাধুলা করার। ড্রইংরুমে চিকন ক্যাম্পখাট পেতে শওকত ঘুমোতো। আর নূপুর আনাজপাতি আদা রসুন চাল ডাল কাগজ পত্র কাপড়চোপড় রাখার ছয় বাই ছয় ফুটের একটা স্টোরেজে বিছানা করে ঘুমোতো। ক'দিনই আর ঘুমিয়েছে নূপুর। কান পেতে থাকতো সারারাত, যদি জয়ের কিছু দরকার হয়। শওকত আর নূপুর নিজেদের ছেলেকে মানুষ করার সুযোগ পায়নি। বরং তাদের ছেলে নিজের বাবা মাকে অমানুষ করার সুযোগটা হাতছাড়া করেনি। তাছাড়া আর কী !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর ভাবতো, জয় সম্পূর্ণই শওকতের রক্ত পেয়েছে, সে কারণেই এই বিদঘুটে মানসিকতার হয়েছে, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝতে চায় না, কোনো সহমর্মিতা নেই, মানবিকতার লেশমাত্র কিছু নেই। যমুনাকে জানিয়েছিল নূপুর, যমুনা বলেছিল, 'জিন বা রক্তই সব কথা হলে পাশার মতো পাষণ্ড হত তপু, কী পরিবেশে বড় হচ্ছে, কী শিখছে, কী দেখছে, সেটা দেখতে হবে। বাচ্চাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব অনেক বেশি। তোদের কোথাও ভুল হচ্ছে। বাচ্চা জন্ম দেওয়া সোজা। বাচ্চা মানুষ করা কঠিন। ওকে রিয়ালিটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিস, মনে হচ্ছে। একটা আনরিয়েল ওয়ার্ল্ড দিয়েছিস ওকে তোরা, একটা ইলিউশান, যেটা ঠিক হচ্ছে না'। সমস্যা নিয়ে কথা বললেই যমুনা বলতো 'তোর ভুল হচ্ছে, তোর ঠিক হচ্ছে না'। যমুনার সমালোচনা তীরের মতো লাগতো নূপুরের গায়ে। যমুনার উপদেশ মানা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যমুনা বলতো, বাইরের খাবার চাইলে বলবি ওটি হচ্ছে না বাপু, ঘরের খাবার খেতে হবে। তোরা যখন খেতে বসবি, ওকে ডাকবি। তোদের সঙ্গে বসে কখনও ও কিছু খায় না, কারণ অভ্যেস করাসনি। সময় তো চলে যায় নি। এখনও সময় আছে অভ্যেস করানোর। যদি বলে খাবো না, বলবি ঠিক আছে, শুতে চলে যাও।

— শুতে চলে যাবে না খেয়ে ?

— হ্যাঁ না খেয়ে। এক রাত না খেয়ে থাকলে কেউ মরে যায় না। ক্ষিদে পেলেই খাবে। যা পায় হাতের সামনে তাই খাবে। তখন আর বলবে না, আমি ফ্রেঞ্চ খাবার খাবো, ইটালিয়ান খাবো, আমার জন্য পিৎজা নিয়ে এসো, আইসক্রিম নিয়ে এসো, চকলেট নিয়ে এসো। বাইরের খাবার খেয়ে হেল্থটাও তো নষ্ট হচ্ছে। ঘরের স্বাস্থকর খাবার খাওয়া ভালো, এ তো তোরাও জানিস।

নূপুর হয়তো যমুনার এই পরামর্শ মেনে চলতো, কিন্তু শওকত মানেনি। আমার ছেলে যা খেতে চায়, তাই আমি খাওয়াবো। নিজে না খেয়ে থাকতে হয় যদি তার জন্য, থাকবো। শওকত জয়কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। যেন জয় তাকে একবার বাবা বলে ডাকে। যেন জয় তাকে বাবার স্বীকৃতিটা দেয়। জয় তার বাবা মাকে 'হেই, ইও, রিটার্ড' এসব বলে ডাকে। নূপুরেরও বড় ইচ্ছে, জয় তাকে মা বলে ডাকুক। বুদ্ধি হওয়ার পর আর ডাকেনি। যমুনা শুনে বলেছে, বুদ্ধি হওয়ার পর বলিস না, বল নির্বোধ হওয়ার পর।

নূপুর যমুনার কবরটার সামনে গার্ডেন চেয়ার পেতেছে চারটে। একটা টেবিল। দুলি চা টা দিয়ে যায় বাগানে। এক চেয়ারে পা তুলে দিয়ে আরেক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকে নূপুর, ফ্ল্যাস্কে চা থাকে। চা শেষ হয়ে গেলে দুলি আবার ফ্ল্যাস্ক ভরে চা দিয়ে যায়। নূপুর পেছনের কথাই ভাবে আর কলকাতার বাড়ির খাটের পাশে যে বইগুলো ছিল, নিয়ে এসেছে, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইগুলো পড়ে। যমুনার পড়া বা এখনও না-পড়া বইগুলো। হয়তো পড়তো বেঁচে থাকলে। নূপুর যেন যমুনাকে পড়ে দিচ্ছে। কিছু বই আর ছবি ছাড়া কলকাতার বাড়ি থেকে আর কিছু আনেনি নূপুর। ঠিক যেভাবে ছিল বাড়ি, সেভাবেই আছে। বসে থাকা আর বই পড়া। এ ছাড়া তার আর কাজ কী ! বয়স পঞ্চাশ হল। যমুনার পঞ্চান্ন হয়েছিল। এপিটাফে জন্ম মৃত্যুর তারিখ সাল কিছুই লেখেনি নূপুর। ইচ্ছে করেই লেখেনি।

নূপুরের গায়ে ব্রহ্মপুত্রের হাওয়া, যে গাছগুলো যমুনার বাঁধানো কবরের চারপাশে বড় হচ্ছে, সে গাছগুলোর পাতা হাওয়ায় নাচে। সবগুলো গাছই যমুনার প্রিয়। শিউলি, গন্ধরাজ, কাঠালিচাপা, জুঁই। কামিনী, হাসনুহানা। দেখতে দেখতেই বড় হয়ে যাবে। ফুল ফুটে চারদিক আশ্চর্য সুন্দর হয়ে থাকবে, টুপটাপ করে ঝরবে ফুল পাতা, পাথরে, ঘাসে। সুগন্ধ ছড়াবে চারদিকে। ব্রহ্মপুত্রের হাওয়াও এই সুগন্ধ গায়ে মেখে উড়ে বেড়াবে।

যারাই নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আত্মীয় স্বজন, চেনা পরিচিত, সবাই নূপুরের কাজকে বাড়াবাড়ি বলেছে। নূপুর সেই একই রকম ম্লান হাসি হেসেছে। কফিনে শুয়ে আছে যমুনা শুনে কেউ কেউ বলেছে, ক্রিশ্চান হয়ে গিয়েছিল যমুনা ! নূপুরের সত্যি বলতে কি কারও কথায় কিছু যায় আসে না। জব্বার কাকা এসে বলেছে, যমুনা তো আমেরকায় থাকতো। তাই না ? এত দূরে ডেডবডি আনার দরকার কী ছিল, ওখানেই কবর দিয়ে দিলে পারতি ! আমেরিকায় তো মুসলমানদের কবরখানা আছে, তাই না ? নাকি ওরা খ্রিস্টানদের সঙ্গেই কবর দেয় !

নূপুর হ্যাঁ না দুরকমই মাথা নাড়ে। তার ইচ্ছে হয় না জব্বার কাকার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। সুলেখা এসেছিল, ওই একই কথা, 'যমুনাবু মরেছে বলে এত চোখের জল ফেলছো কেন, এরপর তো তুমিও যাবে, আমিও যাবো। আমাদের তো নিজেদের কথা ভাবারই সময় হয় না। কেবল পরকে ভেবেই জীবন পার করি !'

— ক্ষতিটা কী এতে ?

সুলেখা চোখ কুঁচকে চারদিক দেখে নিয়ে নূপুরের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে,— ' তুমি নাকি মুসলমান মতে কবর দাওনি ! কবরখানায় কবর দিলে ফেরেসতা আসতো, এখানে তো ফেরেসতা আসবে না !'

এই ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে ফেরেসতা আসবে না। ফেরেসতা আসে কবরখানায়। এ কথা নূপুর প্রথম নয়, প্রায় প্রতিদিনই শোনে। কারও নিন্দায় সমালোচনায় নূপুরের আজকাল কিছু যায় আসে না। যার বাবা নেই, মা নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসতো যে বোনটা নেই, অত সাধের নিজের ছেলেটা নেই, সংসারটাও যে স্বেচ্ছায় লোকে কী বলবে না বলবে তার দিকে না তাকিয়েই ছেড়েছে, তার কাছে আজ পুরোনো এক ছোট শহরেরর ছোট মনের ছোট ছোট মানুষের কথা গায়ে লাগে না। এই শহরে আর যা কিছুর জন্যই সে এসেছে, এই মানুষগুলোর সঙ্গে তথাকথিত সামাজিক জীবন কাটাতে আসেনি।

নূপুর বরং দুলিকে কাছে বসিয়ে গল্প করতে আনন্দ পায়।

নূপুরের বসে থাকে প্রতিদিন যমুনার শুয়ে থাকার পাশে দৃষ্টি তার প্রতিদিন ব্রহ্মপুত্রে। ওই নদীতে যমুনা আর নূপুরের শৈশব কৈশোর কেটেছে, ওই জলে আর হাওয়ায়, ওই পাড়ে আর দ্বীপে। ইস্কুল ফেরা প্রতিটা বিকেলই ছিল খেলার বিকেল। ব্রহ্মপুত্রের সেই পাড়, সেই হাওয়া, সেই কাশফুল, সেই দ্বীপ, সেই খেয়া নৌকো, সেই ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতি আর যমুনাকে পাশে নিয়ে বসে থাকে নূপুর। সন্ধ্যে নামলে তবে ঘরে যায়।

দুলির সঙ্গে গল্প করে দিনের অনেকটা সময় কাটে নূপুরের। নূপুর ফুলির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায়। ফুলপুরের কোনও এক গ্রামে নাতি নাতনি নিয়ে ফুলি থাকে। স্বামী মারা গেছে। যমুনার টাকার ফ্ল্যাট থেকে পালিয়ে ফুলি কোথায় গিয়েছিল ? এই প্রশ্নটি অনেকবার করেও উত্তর মেলেনি। দুলির সেসব কিছু মনে নেই। দুলি ছোট ছিল। দুলির মা দুলিকে এ বাড়িতে কাজ করতো, দুলি ফুট ফরমাশ খাটতো। সেই ছোট দুলি এখন বড় হতে হতে অনেক বড় হয়েছে। বিয়ে হয়েছিল। তালাকও হয়ে গেছে। স্বামী আবার বিয়ে করেছে, দুলি আর তার মেয়েকে খেতে পরতে দেয় না। নূপুর এসে দুলি আর ফুলির খোঁজ করে দুলিকে পেয়েছে। নদীর ওপারের শহর শম্ভূগঞ্জ থেকে ওদের এনেছে, অভাবে ভুগছিল এক দূরাত্মীয়র বাড়িতে। এখন নিজের মেয়েটাকে নিয়ে এ বাড়িতেই থাকে, বাড়িটাকে গুছিয়ে রাখে, রেঁধে বেড়ে নূপুরকে খাওয়ায়। বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর, ঘরগুলোয় ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতি। মাঝে মাঝে নূপুরের মনে হয় পাশের ঘরে বোধহয় তার মা শুয়ে আছে, ওই বুঝি বাবা এলো, যমুনা বুঝি দৌড়ে এসে বলবে চল নদীর পাড়ে চল, প্রচুর কাশ ফুল ফুটেছে। ওই বুঝি খালি পায়ে চলে গেল ওরা। নদীর চরে বাদাম গাছের মাঝখান দিয়ে মাইল মাইল চরের পথ হাঁটলো বাদাম খেতে খেতে, বালি দিয়ে বাড়িঘর বানিয়ে সন্ধ্যে হওয়ার আগে আগে দৌড়ে এসে পড়তে বসলো ইস্কুলের বই। নূপুর পড়ছে ইতিহাসের বই, যমুনা পড়ছে বিজ্ঞানের বই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যমুনার মৃত দেহ বাড়িতে কবর দেওয়ার পেছনে কোনও যুক্তি নেই নূপুর জানে, কিন্তু ভালোবাসা আছে। সব সময় যুক্তি, বুদ্ধি ভালো লাগে না নূপুরের। মাঝে মাঝে অযৌক্তিক, অর্থহীন অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে। এতকাল নিজের ইচ্ছেকে মূল্য দেয়নি। আর যখন মূল্য দেবে বলে ভেবেছে, সুস্থ সুন্দর ইচ্ছে ভদ্রলোকের মতো এসে দাঁড়াবে তা নয়, ইচ্ছেগুলো এলো যাযাবরের মতো, ইচ্ছেগুলোর মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। এ তো নতুন ইচ্ছে নূপুরের। ইচ্ছের চর্চা তো হয়নি, যে, ইচ্ছেকে ভদ্রঘরের কারও মতো দেখাবে ! জীবনে যে ইচ্ছেগুলো সে পুরন করতে পারেনি, সেই ইচ্ছেগুলো এখন আর হাতের কাছে নেই পূরন করার। জয়কে মানুষ করার ইচ্ছেগুলো তীব্র ছিল একসময়, সেই ইচ্ছেগুলো এখন মরে গেছে। এখন আর সে জয় যখন নষ্ট হচ্ছিল দিন দিন, সেখান থেকে জয়কে মানুষ করার জন্য ওঠাতে পারবে না। এখন আর সে জয়কে রিহ্যাবে পাঠাতে পারবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। যে সময় যাওয়ার সে সময় চলে গেছে। এখনকার ইচ্ছেগুলো অন্যরকম।

নূপুর বাইরে যায়, হেঁটে বেড়ায় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। অনেক পুরোনো মানুষ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, তুমি নূপুর না ? তুমি ব্যারিস্টার সাহেবের ছোট মেয়ে তো ?

নূপুর হেসে মাথা নাড়ে। তুমি আমেরিকায় থাকতে না ? কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে। নূপুর মাথা নাড়ে, হ্যাঁ— থাকতাম। এখন দেশেই ফিরেছি। অনেক তো হয়েছে বিদেশ, আর কত ?

— তোমার ছেলেমেয়ে ?

— ছিল একটা ছেলে ছিল, নেই।

— নেই ?

— না নেই। নূপুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, বরং বলে, বুবুর, মানে আমার বড় বোনের মেয়ে তো হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। খুব বড় ইউনিভার্সিটি। নাম শুনেছেন তো ! আসবে, এ বছরই আসবে, আমার সঙ্গে ক'টা দিন কাটাতে আসবে। নূপুর বলে আর চোখে চিকচিক করে জল। তপুর গল্প সে সবাইকে করে। তপু খুব নামকরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বলে ? নূপুর নিজেকে জিজ্ঞেস করে। তপু যদি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজেও পড়তো, তপুকে নিয়ে একই রকম গর্ব হত নূপুরের। মেয়েটা, নূপুর অন্তত এইটুকু বোঝে, মানুষ হয়েছে। তপু মানুষের কথা ভাবে। মানুষ হওয়া তো একেই বলে। মানুষ হয়েছে বলেই তো সে নির্মলার কথা ভেবেছে, যেন বাড়িটায় থাকে, মানুষ হয়েছে বলেই তো নূপুরকে দেখতে ছুটে এলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় নিজের টাকায় টিকিট করে ! মানুষ হয়েছে বলেই তো নূপুরের ইচ্ছের সে মর্যাদা দিল, একটুও টিপ্পনি কাটলো না আত্মায় বিশ্বাস নিয়ে। নূপুরের আত্মায় বিশ্বাস নেই। স্মৃতি কাতরতাই তাকে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বয়ে নিয়ে এসেছে যমুনাকে ! বাঁচার জন্য হাতে তো কিছু থাকতে হয়। হ্যাঁ বই পড়বে, গান শুনবে, ভালো দু'একজন পাড়া পড়শির সঙ্গে কখনও ইচ্ছে হলে গল্প গুজব করবে, কিন্তু এতেও তো দিন ফুরোবে না। যমুনা রইলো।

বাড়িতে সে ইন্টারনেট নিয়েছে, নিজের ল্যাপটপ চালু করেছে। তপুর সঙ্গে প্রায়ই নেটে কথা হয়। আজকাল ফোন আর হয়না। স্কাইপেতে যা কথা হওয়ার হয়। ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে তপু। ঘুমোনার আগে অন্তত কিছুক্ষণ বলে যায়, কী কী হল আজ ইউনিভার্সিটিতে। আজ রিচার্ড ডকিন্স বক্তৃতা দিলেন, অসম্ভব ভালো বললেন। সে যে কী ভিড় তার স্পিচ শুনতে। মা'র খুব ভালো লাগতো শুনলে। তপুকে পলকহীন চোখে দেখে নূপুর। দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোর মা থাকলে ঠিকঠিক তোকে দেখতে হার্ভার্ডে ছুটে যেত।

না গো আসেনি। গত তিন চার বছর কোথাও বেশি বেরোতো না। 'সিস্টারহুড' নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আসেনি তাতে কী, আই অ্যাম সো প্রাউড অফ মাই মাদার।

বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোয় নূপুরের। দুনিয়া একদিকে ছিল, আরেকদিকে ছিল জয়। নূপুর জয় নিয়ে দিন রাত ব্যস্ত ছিল। জয় কী খাবে, জয় কী পড়বে, জয় কী পরবে, কী হলে জয়ের ভালো লাগবে, কী পেলে জয় খুশি হবে। কোনোদিন জয় তাকে ভালো করে মা বলেও ডাকেনি, কোনওদিন বলেনি 'আই অ্যাম সো প্রাউড অব মাই মাদার'। সবার সবকিছু পাওয়া হয় না। নূপুরের হয়নি। যমুনা তপুকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল বটে, দিন রাত তপুর খাওয়া পরা নিয়ে ব্যস্ত হয়নি। বরং শিখিয়েছে অনেক কিছু। মানুষ হতে গেলে শুধু ভালো ভালো খাওয়া আর ভালো ভালো কাপড় চোপড় পরা আর দামি দামি জিনিস কিনে দিলে হয় না, শেখাতে হয় সততা, আর আদর্শ, দেখাতে হয় জগত, বোঝাতে হয় মানবতা।

তপুর জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করে নূপুর। হয় তপুর সঙ্গে সকালে কথা নয়, নয় রাতে। ওদিকে দিন তো এদিকে রাত, এদিকে রাত তো ওদিকে দিন। দিন রাত নূপুরের একাকার হয়ে যায়। দু'মিনিট কথা হলেই নূপুরের প্রাণ জুড়োয়। যমুনার মৃত্যুই যেন দুজনকে আরো কাছে এনে দিয়েছে। তপুর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুরের নতুন করে দেখা হওয়া। স্বামী সন্তানহীন স্বাধীন জীবনে তপুকে আলিঙ্গণ করা। তপুময় জীবন নিভৃতে যাপন করা।

ওদিকে তপু নূপুরকে বলে সব, ঠিক যমুনাকে যেমন প্রতিদিন কী কী হচ্ছে তা বর্ণণা করতো, তেমন করে। যমুনা মারা যাওয়ার পর ডায়রিতে লিখে রাখতো যা যা যমুনাকে বলতে চাইতো সব। এখন আর লেখে না। এখন নূপুরকে যেহেতু বলতে হয়, নূপুরকেই বলে। ডায়রিতে আগের মতো ঘটনাগুলো লেখা হয় না । যমুনার জায়গাটা অজান্তেই দখল করে নিয়েছে নূপুর। তপু টের পায়। ধীরে ধীরে টের পায়। ক তোমার আত্মীয়, সুতরাং ক' কে ভালোবাসতে হবে, এভাবে ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসা ভেতরে অনুভব করতে হয়।

নির্মলার হাতে লেখা একটা চিঠি আসে এর মধ্যে একদিন।

প্রিয় নূপুর,

প্রিয় তপু,

তোমাদের দুজনকে একসঙ্গেই চিঠিটা লিখছি। দুজনই এ বাড়িতে থেকে গেছো ক'টা দিন, কিন্তু তোমাদের বলিনি। অনেকবার ভেবেছি বলবো, কিন্তু আবার দ্বিধায় ভুগেছি। যমুনা বলেছিল তোমাদের যেন না জানাই। যমুনা তো তার মরণোত্তর দেহখানা দিয়েছিল মেডিক্যালে, তার ওই ইচ্ছে যখন পালন হয়নি, তখন কাউকে না জানানোর এই ইচ্ছেটা কেন পালন করতে হবে ? আমাকে বলেছিল তোমাদের না জানাতে, অনেকদিন জানাইনি, এখন না জানানোর কোনও কারণ দেখি না। কারণ তার ইচ্ছেকে যে কারণেই হোক আমরা মূল্য দিচ্ছি না। তার মানে এই নয় যে তাকে আমরা ভালোবাসি না। ভালোবাসি বলেই হয়তো মূল্য দিচ্ছি না। কেন গোপন রাখবো সত্য ! এখন আমার এটা মনে হচ্ছে, তোমাদের অধিকার আছে সত্য কথাটা জানার। তোমরা জানো যে যমুনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। যমুনার হাতে গোণা ক'জন বন্ধু ছাড়া আর সবাই তা জানে। কিন্তু যমুনার হার্ট অ্যাটাক হয়নি। অনেকদিন যমুনা ডায়বেটিসে ভুগছিল। ডাক্তার ইনসুলিন নিতে বলেছিল। কিন্তু ইনসুলিন নেয়নি যমুনা। ধীরে ধীরে এক সময় কিডনি নষ্ট হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বলাটা ঠিক হবে না, দ্রুতই দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। ডাক্তার ফের বলে যায়, শীঘ্র ডায়ালায়সিস করানোর জন্য। দিন তারিখ সব নিয়ে আসি আমি ডায়ালাইসিসের। কিন্তু যমুনা যাবে না। ডাক্তার বারবার বলেছে, ডায়ালাইসিস না করলে যমুনা বাঁচবে না। শুনেছে যমুনা, বুঝেছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডায়ালাইসিস না করার। কিছুতেই ওকে রাজি করাতে পারিনি। তোমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে পারো, যমুনা আত্মহত্যা করেছে। হ্যাঁ করেছে, ঠাণ্ডা মাথায় করেছে। কেন করেছে, তা আমি জানি না।

যদি জিজ্ঞেস করো, যমুনা কি ডিপ্রেশনে ভুগতো ? আমি অনেক বছর যমুনাকে কাছ থেকে দেখছি। কোনোদিন কোনও ডিপ্রেশন দেখিনি। কোনোদিন কিছু নিয়ে হতাশ ছিল ও ? আমি দেখিনি। আমি জোর গলায় বলতে পারি, ছিল না। খুব প্রাণবন্ত, উচ্ছল, উজ্জ্বল জীবন্ত মানুষ ছিল। মন খারাপ করে কোথায় বসে থাকা, কিছু নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করা, এই চরিত্র যমুনার নয়।

কেরালা থেকে এসে সোলার পাওয়ারের ওই চাকরির পাশাপাশি 'সিস্টারহুড' অরগানাইজেশন নিয়ে কলকাতায় ব্যস্ত ছিল। সিস্টার হুডকে তো দাঁড় করিয়ে গেল। আজ এই সংগঠনের পাঁচ হাজার সদস্য। রাজ্যের ক'টা নারী সংগঠন এত অল্প সময় এভাবে দাঁড়াতে পারে ! আমার হাতে এখন দায়িত্ব, জানিনা কতটা পারবো একে টিকিয়ে রাখতে। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। ফান্ড আছে। অসুবিধে নেই। যমুনা দেশ বিদেশ থেকে সিস্টারহুডের জন্য যে ফাণ্ড জোগাড় করেছে, তা দিয়ে সংগঠন কয়েক বছর চমৎকার চলবে। শুধু আমিই নই, সিস্টারহুডের দু'তিন জন মেয়ে, ডাক্তাররা, আমি তো আছিই, দিন রাত বুঝিয়ে ডায়ালাইসিসের জন্য রাজি করতে চেয়েছি, রাজি হয়নি যমুনা। বলেছে, 'ধ্যাৎ এভাবে অন্তর অন্তর রক্ত পাল্টে বেঁচে থাকতে হবে, এ আমার সইবে না। অনেক বেঁচেছি। আর কত ! মাঝে মাঝে মনে হয় কয়েক হাজার বছর বুঝি বাঁচা হয়ে গেছে। নিজের মতো করে বেঁচেছি, নিজের মতো করে মরতে চাই'।

তোমরা যদি অনুরোধ করতে যমুনাকে ডায়ালাইসিস করার জন্য, কাজ হতো কি না জানি না। আমাদের কথায় কাজ হয়নি। সত্যি বলতে কী, যমুনার এই সিদ্ধান্ত আমি মানিনি। এত সংগ্রামী একজন মানুষ এমন ভেঙে পড়া মানুষের মতো সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল কে জানে।

তোমরা ভগবানে বিশ্বাস করো না। আমি করি। ভগবান যখন ডাকবেন, তখন চলে যাবো। কিন্তু না ডাকার আগেই নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে যাবো কেন, এ জীবনটাকে ভাল না বাসার লক্ষণ, ভগবানকেও অবজ্ঞা করার লক্ষণ। হাসিখুশি মানুষটা জীবনে সংগ্রাম করেছে অনেক। কোনও বাধাকে ভয় পায়নি। কোনো শত্রুকে পরোয়া করেনি। কোনো রোগ শোকে কাবু হয়নি। কিন্তু চিকিৎসা যেখানে আছে, সেখানে চিকিৎসা না নিয়ে তার মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আজও আমাকে খুব বিভ্রান্ত করে। নিজেকে দোষী মনে হয়। আমি কি যথেষ্ট ভালোবাসিনি ? এত ভালো আমি কাউকে বাসিনি। এ কথা জেনে রেখো। তোমরা বাড়িটা আমার দায়িত্বে দিয়ে গেলে। এত স্মৃতি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল ঘোরের মধ্যে থাকা হয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। তপু আসবে বলে যমুনার মতো অপেক্ষা করবো, বাড়িঘর গুছিয়ে রাখবো। আমার পক্ষে তো আমেরিকায় যাওয়া সম্ভব হবে না। নূপুর রাজি হলে আমি বরং বাংলাদেশে ঘুরে আসতে পারি। যমুনাকেও দেখে আসবো, যমুনা কোথায় জন্মেছে, কোথায় বড় হয়েছে, আর তাছাড়া ব্রহ্মপুত্রও আমার দেখা হয়নি কখনও। দেখবো ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে কী রকম জীবন কাটাতো যমুনা।

আমি ইমেইলে অভ্যস্ত নেই বলে চিঠি লিখলাম। তোমরা বোধহয় চিঠি টিঠি আর লেখো না। তপু তো হাতে কিছু লেখেই না। যমুনার একটা ইমেইল ছিল। jamunakolkata@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠালে আমি ইমেইল পাবো। সিস্টার হুডের অফিসে যে কমপিউটার আছে, ওতেই দেখবো। যমুনার ল্যাপটপটা আমি তুলে রেখেছি যত্ন করে। ওটা ধরবো না। ওটা তপু এলে ব্যবহার করবে।

তোমরা ভালো থেকো। যমুনার আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত শুনে তোমাদের মন খারাপ হবে জানি। কিন্তু পারো তো ওকে ক্ষমা করে দিও। ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি।

তোমাদের নির্মলা

AMARBOI.COM

চিঠিটা দুপুরে পড়েছে নূপুর। বিকেলে যমুনার কবরের পাশে বসে জোরে জোরে আবার পড়ে চিঠিটা। জোরে কেন পড়ে, যমুনা শুনবে বলে ! নূপুর জানে কাঠের কফিনটার মধ্যে যমুনার শরীরের মাংস শুকিয়ে ঝরে পড়েছে, কংকাল বেরিয়ে এসেছে, তারপরও তার বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, ওখানে যমুনা আছে, তাকে শুনছে, নূপুর কী বলছে শুনছে, কী করছে দেখছে। চিঠি কি নিজেকেই আবার শোনায় নূপুর !

দুলি চা দিয়ে যায়। নদীর ওপর সূর্য ডুবছে। লাল সূর্য। 'যত রঙিন সূর্য, তত ধুলো বালি শহরে', যমুনা বলেছিল একবার। যে যমুনা বাঁচার কথা বলতো সে কিনা ইচ্ছে করে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে, নূপুরের বিশ্বাস হতে চায় না। নির্মলার চিঠির ওই জায়গাগুলো আবার পড়ে সে। লাল কালিতে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ে, ডায়ালাইসিসে সে যে ইচ্ছে করেই যায়নি সে অংশটা। পড়লে গা কাঁপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূপুর সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পরও উদাস বসে থাকে। দুলি এসে বলে, ঘরে চলো খালা। ঘরে যেতে যেতে নূপুর বিড়বিড় করে বলে, বুবু মনে হয় তপুকে আমার কাছে দিয়ে গেল। আমি সন্তান হারিয়েছি, এই দুঃখ যেন আমাকে বইতে না হয়।

নূপুরকে দূর্বল করে দিয়েছে নির্মলার চিঠি। ফোন করে তপুকে সে। তপুর এখনও চিঠি পাওয়ার কথা নয়। চিঠি ভারত থেকে বাংলাদেশেই আগে এসেছে। আমেরিকায় পৌঁছোতে দুটো দিন দেরি হবে।

নূপুর বলে, কী রে উঠেছিস ঘুম থেকে ?

তপু ওদিক থেকে হেসে বলে, হ্যাঁ এই মাত্র। চা খাচ্ছি।

— নিজেকেই বানাতে হয় চা টা ?

— নিজেই তো বানাবো নিজের চা।

— আজ লেকচার আছে ?

— এই তো যাচ্ছি।

— নির্মলা একটা চিঠি পাঠিয়েছে কুরিয়ারে তোকে আর আমাকে। আমার চিঠিটা আমি আজই পেয়েছি। তোরটা বোধহয় আজ কালের মধ্যে পেয়ে যাবি।

— তাই বুঝি, নির্মলা মাসি কখনও আগে কুরিয়ার করেনি।

— দুপুরে কী খাবি ?

— কেনেডি ইস্কুলের ক্যাফেটোরিয়ায় ভালো খাবার পাওয়া যায়। ওখানেই খেয়ে নেব। তুমি চিন্তা করো না নূপুখালা।

নূপুর হেসে বলে,— তোকে ইচ্ছে করছে কপালে একটা চুমু খেয়ে বলি, সারাদিন ভালো থাকিস। মন ভালো রাখিস।

— তুমি খুব লাভিং অ্যান্ড কেয়ারিং নূপুখালা। মাও ছিল। কিন্তু এক্সপ্রেস করতো না। আই লাভ ইউ।

— আই লাভ ইউ টু।

ফোন রেখে নূপুর লক্ষ্য করে চোখে জল তার। ভেজা চোখ দুটো আঁচলে মুছে নেয়।

দুলি আর দুলির মেয়ে পাশের ঘরে ঘুমোয়। ওরা ঘুমোচ্ছে। ঘরগুলোয় হাঁটে নূপুর। যে ঘরটা নূপুরের ঘর ছিল, যে ঘরটা যমুনার ছিল, যে ঘরটা দুজনের পড়ার ঘর ছিল, বাবা মার ঘর, নাইমের ঘর, খাবার ঘর। হাঁটে আর ভাবে, তপু এলে ঠিক বাড়ি ঘর সাজাবে সে, ঠিক আগের মতো, আগে যেমন ছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমন করে। যমুনা যে ক'টা ছবি বাধিঁয়েছে তপুর আর নূপুরের, সবগুলো ছবি সে দেয়ালে টাঙিয়ে দেবে। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে যমুনাকে নিয়ে যেমন হাঁটতো নূপুর কিশোর বয়সে, তেমন হাঁটবে তপুকে নিয়ে। না, নূপুর ভাবে, জয়কে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল, সেই স্বপ্ন নূপুরের মধ্যে তপুর জন্য একটু একটু করে জমছে, জয়কে ভেবেছিল দেখাবে তার শৈশব কৈশোর, যৌবনের সব অলি-গলি, সব গাছ-পাথর, সব নদী-নালা, সব জল। দেখানো হয়নি। জয় দেখতে চায়নি। নূপুর এখন তপুকেই দেখাবে সব। তপুর জন্য এই বাড়িটা রেখে একদিন যমুনার মতো সেও চোখ বুজবে। হয়তো তপুকে অনুরোধ করবে আমি যেদিন মারা যাবো, আমাকে তোর মা'র পাশে শুইয়ে দিস। এপিটাফে লিখিস, 'একজন, যে খুব মা হতে চেয়েছিল'। এটুকুই। নূপুর মনে মনে আরও একটু জুড়ে দেয়, 'জগত তাকে যতই বলুক মা হতে সে পারেনি। সে কিন্তু পেরেছিল মা হতে। নিজের সন্তানের না হলেও, অন্য কারও সন্তানের'।

AMARBOI.COM

দুলির মেয়ের শরীর ঘামছে। নূপুর পাখাটা চালিয়ে দেয়। দুলির মাও দুলিকে নিয়ে ঠিক এভাবে এ ঘরেই ঘুমোতো। দুলির শরীরও ঘামতো এভাবে। আর এভাবেই নূপুর তখনও পাখাটা নিঃশব্দে চালিয়ে দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~